প্রবাসী

পঞ্চম বর্ষ

শারদীয়া ১৪৩১

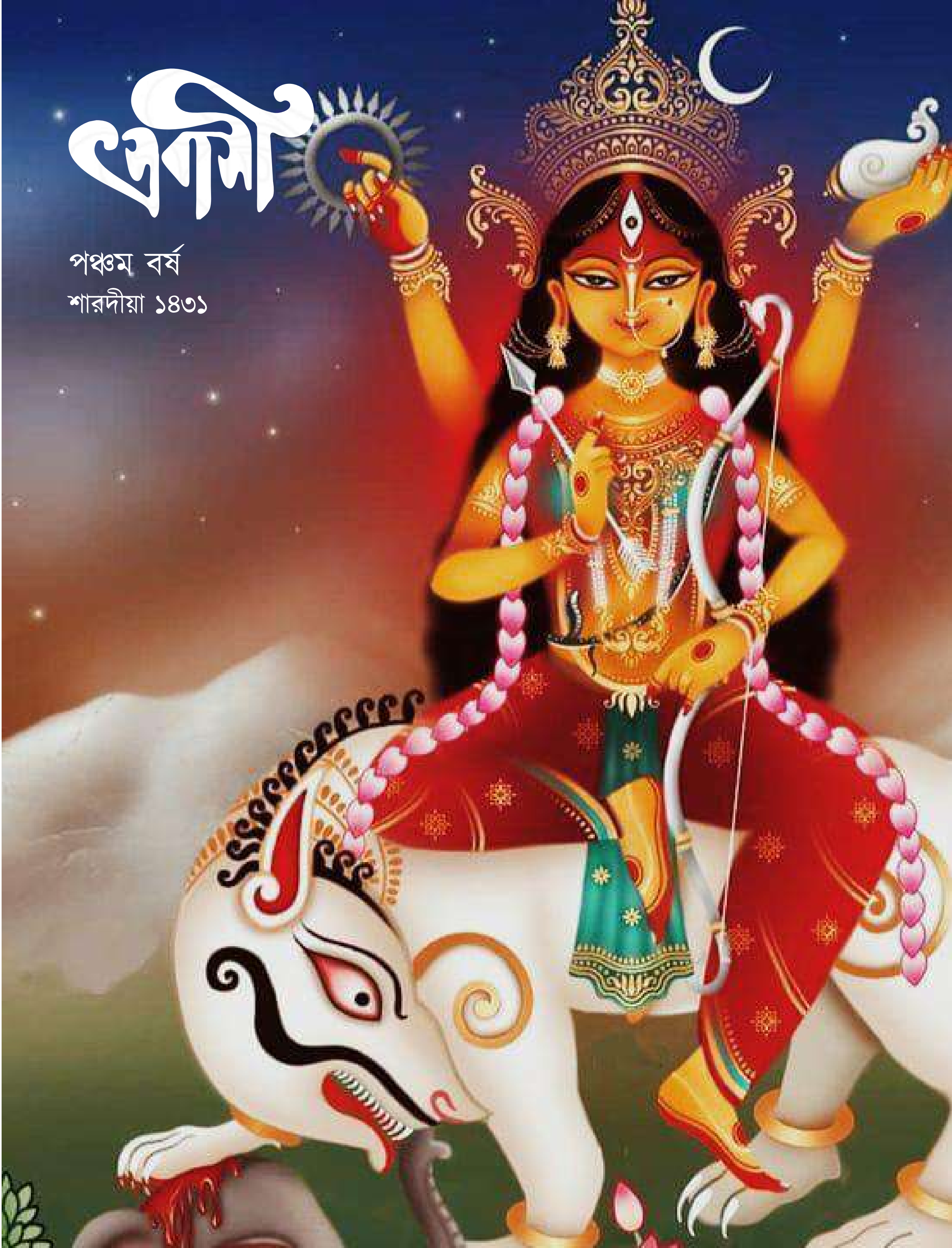

AURUM
SINCE 2020
THE INDIAN JEWEL
CATERING
Scan Here
Our Services:
Weddings
Dinner Parties
Corporate Events
Lunches / Office Meetings
Contact Us
(650)-383-5221
https://aurumca.com/
132 State St. Los Altos, CA, 94022

প্রবাসী

শারদীয়া ১৪৩১
অক্টোবর ২০২৪

সম্পাদকীয় ৯

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : পুরাণ কথা
দেবাশিস পাঠক ১০

মৌমিতা ৩৪

শারদ গল্প

প্রচেত গুপ্ত ১৭

সিজার বাগচি ২১

ইন্দ্রনীল সান্যাল ২৮

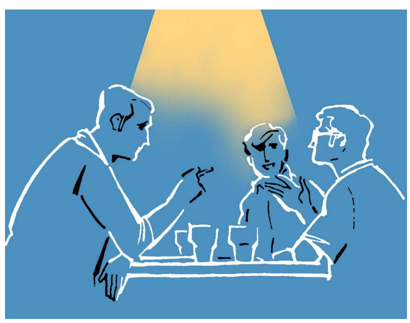

সুমন সরকার ৩৯

কবিতা

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী ৪৪

রাজদীপ রায় ৪৫

মণীষা মুখোপাধ্যায় ৪৬

নিরঞ্জন রায় ৪৭

আনিন্দ্য পাঠক

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮

মঞ্জুশ্রী সেন

অনিন্দ্য পাঠক ৪৯

অরুনাশিষ সোম

Adrija Basu ৫০

Adut Loi Akok

রম্যরচনা

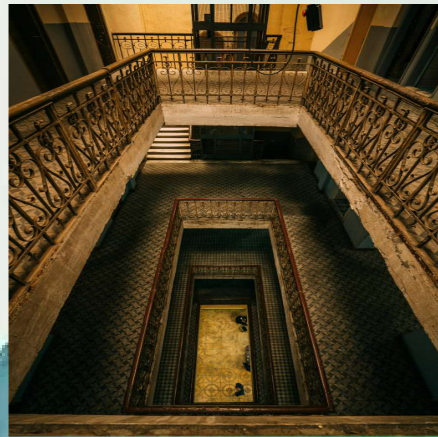

সুন্দর মুখোপাধ্যায় ৫১

আনির্বান দাশ ৫৩

কল্লোল চ্যাটার্জী ৫৫

দিলীপ চক্রবর্তী ৫৯

প্রচ্ছদ : সুমন মণ্ডল

সম্পাদনা : উল্লাস মল্লিক

সমন্বয় সাধন : দীপংকর সেন

অলঙ্করন : অভি, শ্রীতমা রক্ষিত, নেহা করন

বিন্যাস: রমাপদ পাহাড়ি, কৌশিক মুখোপাধ্যায়

SAVOR THE DIVINE SWEETNESS OF
DURGA PUJA!
rangoli
rangoli
CALL: (408)244-1160
OPEN All DAYS | 1:30 AM - 2:00 PM and 5:00 PM - 9:30 PM
Location: 1584 Halford Ave, Santa Clara, CA 95051

‘"বাজলো তোমার আলোর বেণু"

Dear Prabasi Community,

Sharodiya Shuvechcha to all of you. I hope you enjoyed the Durga Puja and looking forward to the rest of the year as we embark on our journey to support our community in the Bay Area and back in India. Bay Area Prabasi is in its 51st year and I want to take a moment to reflect on our journey and express my heartfelt gratitude for your unwavering support. Fifty-one years is not just a milestone; it is a testament to the dedication, passion, and resilience of each member, patron and well-wishers who have contributed to our mission.

In the backdrop of the social and political upheaval around the world, it is the support of a community organization like ours that can help tide over difficult times. It brings together our families and loved ones and gives them the comfort and support they need. In the spirit of our mission to be a philanthropy-oriented organization and give back to our roots, we've embarked on a couple of projects. One is Project Abhaaya is a comprehensive and free service for women in West Bengal who are experiencing gender violence, emotional abuse, or domestic abuse. We dedicate this initiative to the memory of Abhaya, and through grassroots support and policy advocacy, we strive to create a society where all women can live free from fear and violence. The other is Project Sayambharataa, which is on a mission to build and operate a distant-learning, technology-enhanced center in Birbhum District. I hope you will come forward to support these projects in the coming days.

I would once again like to thank all of our volunteers who tirelessly work to bring all of our events to life. None of these would have been possible without your unwavering support and dedication. Let us look forward to the coming years - one filled with hope, innovation, and unwavering commitment to our mission.

With gratitude,

Saikat Paul (Chairman/President)

Groceries for Your Divine Celebration
this Festive Season.
MADRAS
GROCERIES
Indian Super Market
CALL: (408) 746-0808
OPEN All DAYS | Mon - Fri : 10AM - 10PM | Sat - Sun : 9A.M - 10PM
Location: 1187 W El Camino Real. Sunnyvale, CA 94087
Coming soon: In Newark/ Fremont
5438, Central Ave. Newark, CA 94560

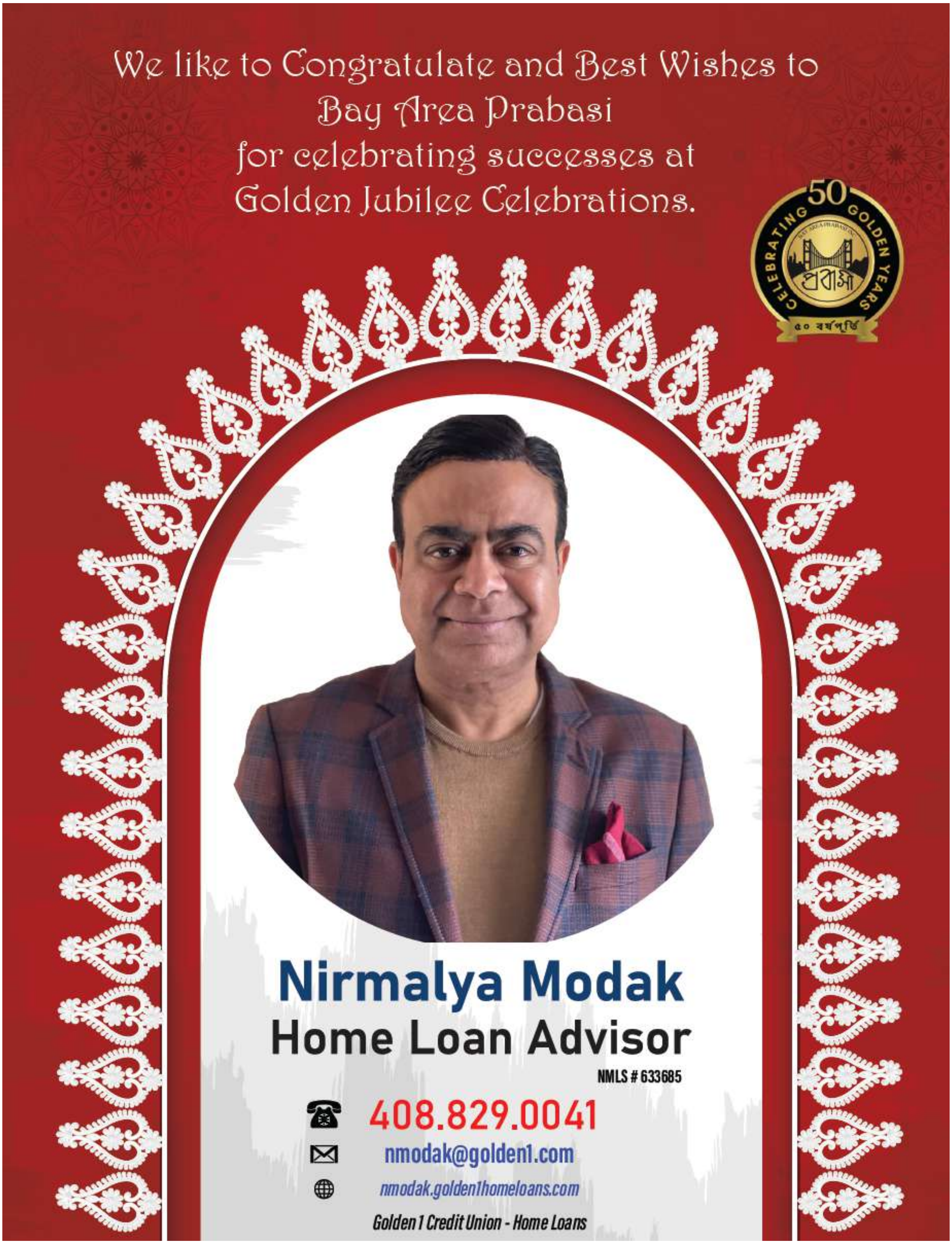
We like to Congratulate and Best Wishes to
Bay Area Prabasi
for celebrating successes at
Golden Jubilee Celebrations.
CELEBRATING 50 GOLDEN YEARS
প্রবাসী
৫০ বর্ষপূর্তি
Nirmalya Modak
Home Loan Advisor
NMLS # 633685
408.829.0041
nmodak@golden1.com
nmodak.golden1homeloans.com
Golden 1 Credit Union - Home Loans

Best compliments from

LurniGo

College Counseling | Test Prep | Academic tutoring

www.lurnigo.com +1 (669) 305-6669

পূজাবার্ষিকী ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না মায়ের পূজার উপাচার

দেখতে দেখতে আহ্নিক গতির নিয়ম মেনে পৃথিবী একটা পাক খেয়ে নিল। আবার এসে গেল বাঙালির উৎসবের ঋতু। আকাশে কালো মেঘের দামালপনা বন্ধ। হয়ত অন্য কোথাও গিয়ে হুল্লোড়বাজি করছে তারা। বাংলার আকাশ এখন ঝকঝকে নীল। মনে হয়, এক টুকরো ভেঙে নিয়ে মুখের সামনে ধরলে প্রতিবিম্ব দেখা যাবে। ফুলবাবু ধরনের কিছু সাদা মেঘ ইতিউতি ভেসে বেড়াচ্ছে। সকালের দিকে একটু হিমেল ছোঁয়া, মাঠে-ঘাটে কাশফুল যেন শান্তির পতাকা ওড়াচ্ছে। পুকুর দিঘি জল থইথই। শালুক পদ্ম হাসছে। অর্থাৎ প্রকৃতি সাজগোজ করে বসে আছে উমা-মাকে বরণ করে নেবে বলে।

তুমি এসো মা, ত্রিনয়নী, দশপ্রহরণধারিণী, সমাজের পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূর কর, দূর কর আমাদের মনের মলিনতা।

এটা গেল একটা দিক আর অন্যটা হল এই উৎসবে সেজে উঠছে শারদ পত্রিকা। গ্রাম থেকে শহর, দেশ থেকে বিদেশ, যেখানে বাঙালি, যেখানে পত্রিকা সেখানেই শারদ সংখ্যা। পূজাবার্ষিকী ছাড়া যেন মায়ের পুজোর উপাচার সম্পূর্ণ হয় না। এখন প্রযুক্তির এই সুসময়ে, শুধু হার্ড কপির পত্রিকা নয়, সঙ্গে প্রকাশ পাচ্ছে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের পূজাবার্ষিকী। যে কোনও সময় যে কোনও অবস্থায় একটা আঙুলের স্পর্শে খুলে যাবে বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত। আপনি মুক্ত বিহঙ্গের মতো ডানা মেলে দিতে পারেন। প্রবাসী [বে-এরিয়া] প্রতি বছরের মতো এবারও শারদ সাহিত্যের ডালি নিয়ে হাজির হয়েছে আপনাদের কাছে। বিখ্যাত থেকে স্বল্পখ্যাত সবাই তাঁদের সেরা সৃষ্টি তুলে দিয়েছেন আমাদের হাতে। আপনাদের ভালো লাগলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক।

উল্লাস মল্লিক
সম্পাদক

মহিষাসুরমর্দিনী, দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গা

দেবাশিস পাঠক

শিক্ষক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার বহু ছাত্রপাঠ্য বইয়ের প্রণেতা। পাশাপাশি বিভিন্ন বাংলা পত্র-পত্রিকায় লিখে চলেছেন গবেষণাধর্মী মননশীল প্রবন্ধ। বিষয়সূচির দিগন্তে পুরাণ-মহাকাব্য-অধ্যাত্ম জগৎ থেকে শুরু করে সমকালের রাজনীতির বর্ণালিমাখা রংধনু।

দুর্গা। এই নামটি এল কোথা থেকে?
দুর্গতি নাশ করেন তিনি। তাই-ই তিনি দুর্গা। এমন একটা ধারণা সাধারণ্যে প্রচলিত। পুরাণ কিন্তু অন্য কথা বলছে।

দেবী ভাগবত অনুসারে, হিরণ্যকশিপুর ভাই হিরণ্যাক্ষ। তাঁকেও বিষ্ণু মেরেছিলেন বরাহ অবতারে। দাঁত দিয়ে। আর হিরণ্যকশিপুকে মারলেন নখ দিয়ে। নৃসিংহ অবতারে। এই দৈত্য বংশেই জন্ম নিয়েছিল দুর্গম। বিন্ধ্যাচলের মতো দুর্গম জায়গায় বাস করত সে। আর পূর্বপুরুষদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সেখান থেকেই দেবতাদের রাজপাট, বৈদিক সংস্কৃতি, সবকিছু বিপন্ন করে তুলল। দেবতারা যে তাকে হত্যা করবেন তার পূর্বসূরীদের মতো, সে উপায় ছিল না ব্রহ্মার সৌজন্যে। ব্রহ্মা চিরকালই উদারহৃদয়। সৃষ্টিকর্তা হিসেবে দেব-দানব সবার প্রতিই প্রসন্ন হৃদয়। তপস্যায় তুষ্ট করতে পারলে বরদানে বঞ্চিত করেন না কাউকেই। দুর্গম অসুরও পেয়েছিল ব্রহ্মার বর। ত্রিলোকে কেউ তাকে মারতে পারবে না, যদি না সে এমন নারী হয়, যে অনাবদ্ধকে আবদ্ধ করতে পটু। অতএব দুর্গম নিধনের জন্য দেবতারা শরণাপন্ন হয়েছিলেন নারী শক্তিরই। তাঁর হাতেই নিহত হয় দুর্গম। অবসান হয় আসুরিক অনাচারের। আর সেই নারী শক্তি, দুর্গম নিধনের কারণে দুর্গা নামে পরিচিতা হন। দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা বা প্রকীর্তিতা।
তবে ভক্তি অত পণ্ডিতির পথে চলে না। তার পথটি অত শাস্ত্র পুরাণের গলিঘুঁজি চেনে না। সে পথটি সহজ এবং সরল। তাই, সে মাতৃনামের আড়াল-আবডালে থেকেই চিনে নেয় নির্দিষ্ট রসদ। তাঁর প্রাণের,তাঁর চৈতন্যের। তাই শাস্ত্র লিখল,
দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পরিকীর্তিতঃ।
উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মত।।
রেফো রোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ।

ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চাকারঃ পরিকীর্তিত।।

অর্থাৎ, 'দ'অক্ষরটি দৈত্য বিনাশ করে, উ-কার বিঘ্ন নাশ করে, রেফ রোগ নাশ করে, 'গ' অক্ষরটি পাপ নাশ করে এবং অ-কার শত্রু নাশ করে। এর অর্থ, দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ ও শত্রুর হাত থেকে যিনি রক্ষা করেন, তিনিই দুর্গা

অক্ষরে অক্ষরে ভক্তির উদগীরণ। ইচ্ছাপূরণের ইঙ্গিত। অশুভ বিনাশী সংকেত।

শরতে দুর্গাপুজোর শুরুটা কবে থেকে? মানে, ঠিক কোন তিথি থেকে শারদ উৎসবের সূচনা মুহূর্ত সংকেতিত?

এ নিয়েও মতান্তর অনর্গল।

উল্লিখিতপ্রশ্নের অবধারিত উত্তর, মহালয়া। মানে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অমাবস্যা তিথি।

আজ থেকে অর্ধ শতাধিক বছর আগে, আমাদের ছোটবেলায় অত পঞ্জিকা, তিথি, শুভাশুভ নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন অনুভব করতাম না। বাবাকে দেখতাম, তর্পণ করার জন্য গঙ্গার ঘাটের দিকে রওনা দিতেন। তার আগে বাড়ির সকলের সঙ্গে রেডিওতে মহিষাসুরমর্দিনী শুনতেন। আর ওই অনুষ্ঠানে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের উদাত্ত কণ্ঠে "আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোক-মঞ্জীর; /ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা" শোনামাত্র আমাদের দুর্গাপুজো শুরু হয়ে যেত।

এখন, অর্ধশতাধিক বছর পর, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ শাসিত ধরণীতে জানছি, দুর্গাপুজোর সঙ্গে মহালয়ার কোনও যোগ নেই। মহালয়া শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানের মতো, তর্পণ ইত্যাদির মতো পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদনের তিথি। না, কিংবা জানানোর চেষ্টা করছি না, কালিকাপুরাণ অনুসারে, এই কাত্যায়ন কন্যা কাত্যায়নীর আবির্ভাব তিথিটি হল ঠিক মহালয়ার আগের দিন। অর্থাৎ, আশ্বিন মাসে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথি। কালিকাপুরাণের ষাটতম অধ্যায় বলছে, দেবতাদের "তেজোরাশি হইতে উপজাতশরীরা দেবী কাত্যায়ন কর্তৃক প্রথমে সন্ধুক্ষিত এবং পূজিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাহাকে কাত্যায়নী বলা হয়। তাহার পর সেই দশভুজা জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী মহাদেবী, মহিষাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন। সেই মহাদেবী দেবগণ কর্তৃক সংস্তুত এবং প্রবোধিত হইয়া, আশ্বিন মাসে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর দিনে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সুশোভন শুক্লপক্ষের সপ্তমীর দিবস দেবগণের তেজে সেই দেবীমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। অষ্টমীতে দেবগণ নানাবিধ অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করিয়াছিলেন। নবমীতে দেবী নানাবিধ উপহার দ্বারা পূজিভ হইয়া মহিষাসুরকে নিহত করেন এবং দশমীতে দেবগণ কর্তৃক বিসৃষ্ট হইয়া অন্তর্ধান করিলেন।" (৭৭ - ৮১ নং শ্লোক; পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নকৃত বঙ্গানুবাদ।)

অর্থাৎ, মহালয়াকে দুর্গোৎসবের পরিধি থেকে বাদ দিলে দেবীর আবির্ভাবের তিথিটিই বিসর্জিত হবে।

ইদানিং আবার পণ্ডিতাভিমানী রাজনীতিকরা ফেসবুক ও হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপের আশ্রয়ে মহালয়াকেন্দ্রিক একটি নতুন বক্তব্য ছড়িয়ে দিতে তৎপর হয়েছেন।

এতদিন পণ্ডিতম্মন্য শাস্ত্রজ্ঞানশূন্যের দল বলে

সুশোভন শুক্লপক্ষের সপ্তমীর দিবস দেবগণের তেজে সেই দেবীমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। অষ্টমীতে দেবগণ নানাবিধ অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করিয়াছিলেন। নবমীতে দেবী নানাবিধ উপহার দ্বারা পূজিত হইয়া মহিষাসুরকে...

আর,দুর্গাপূজা আনন্দ-উৎসব। এ দুয়ের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজতে চাওয়া নাকি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম। স্রেফ মহালয়ার সকালে বেতারে চণ্ডীপাঠ সম্প্রচারের কারণে নাকি মহালয়া দুর্গোৎসবের পরিধিতে ঢুকে পড়েছে। এ নিয়ে ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপে বিস্তর তর্কবিতর্ক, পণ্ডিতম্মন্যদের আকচা-আকচি।

যাঁরা এই মতের প্রচারক তাঁরা সংস্কৃতিমনা হতে পারেন, শাস্ত্রজ্ঞ নন। আবার যাঁরা এই মতের বিরুদ্ধাচরণ করছেন, তাঁরাও আবেগে টগবগ করতে পারেন, পুরাণ নিয়ে চর্চার সুযোগ বড় একটা পান না। এই দুই নেতির কারণে যেটা আড়ালে চলে যাচ্ছে সেটি একটি পৌরাণিক সত্য। শাস্ত্রসিদ্ধ বিষয়।

সেটা হল, দেবী দুর্গার আবির্ভাবের সঙ্গে মহালয়ার যোগাযোগ প্রত্যক্ষ। এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহিষাসুরমর্দ্দিনী অনুষ্ঠানেও সেকথা অনুক্ত থাকে না, কিন্তু গুরুত্ব অর্জনে ব্যর্থ হয়।

আমরা বছরের পর বছর ধরে শুনছি,বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বলছেন, "দেবী ঋষি কাত্যায়নের কন্যা কাত্যায়নী, তিনি কন্যাকুমারী আখ্যাতা দুর্গি। তিনিই আদিশক্তি আগমপ্রসিদ্ধমূর্তিধারী দুর্গা, তিনি দাক্ষায়ণী সতী।" অথচ জানছি আসছিলেন,মহালয়া দুর্গাপূজার সঙ্গে সম্পর্করহিত একটি তিথি। আর এখন রাজনীতির আশ্রয়ে ধর্মধ্বজী হওয়ার প্রণোদনায় অনেকে প্রচার শুরু করেছেন, মহালয়ার আগে দুর্গাপুজোর উদ্বোধন শাস্ত্রবিরোধী কর্ম। এমন অশাস্ত্রীয় কর্মের কারণে সনাতন ধর্ম একেবারে রসাতলে যেতে বসেছে।

বলতে বাধা নেই,মহালয়াকে দুর্গাপুজোর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বলে প্রচার করাটা যতটা অশাস্ত্রীয়, মহালয়ার আগে পুজোর ঢাকে কাঠি পড়ার বিরোধিতাও ততটাই অশাস্ত্রীয়, এমনকী অনৈতিহাসিক সংনমন।

রঘুনন্দনের দুর্গোৎসব তত্ত্বে শারদীয় দুর্গাকেন্দ্রিক উৎসবের ছ'টি কল্প বিধান আছে। 'কল্প'শব্দটির দুটি অর্থ। এক অর্থে 'কল্প'হল যুগ বা সময়কাল। অপর অর্থে 'কল্প'হল 'বৈধ আচার',অর্থাৎ ব্রত পালন যা যজ্ঞানুষ্ঠানের তুলনায় ঈষৎ ন্যূন। দুর্গোৎসবের ছ'টি কল্প এরকম :

১. কৃষ্ণনবম্যাদি কল্প : এই কল্প অনুসারে ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যাবেলায় বেলগাছের ডালে দেবীর বোধন হয়। তারপর আমন্ত্রণ ও অধিবাস। 'অধিবাস'-এর অর্থ

'মাঙ্গলিক দ্রব্যের দ্বারা সংস্কার। এইভাবে দেবী পূজার সূচনা ঘটে, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণানবমীতে। পরের পনেরো দিন ধরে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২. প্রতিপদাদিকল্প : এই কল্প অনুসারে দেবীর বোধন হয় আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদে। তারপর অর্থাৎ মহালয়ার পর ন'টি রাত্রি ধরে দেবীর অর্চনা করা হয়। এই কল্পই হল নবরাত্রি ব্রত।

৩. ষষ্ঠ্যাদি কল্প : এটির সঙ্গে আমরা সর্বাধিক পরিচিত। এই কল্প অনুসারে ষষ্ঠীতে দেবীর বোধন, তারপর তিন দিন, সব মিলিয়ে চারদিন ধরে দেবীর পূজা হয়।

৪. সপ্তম্যাদি কল্প: এই কল্পের প্রধান আচার নবপত্রিকার স্নান। সমবেতভাবে নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গা। কিন্তু এর এক-একটি উদ্ভিদ দেবীর এক একটি রূপের প্রতীক। কলা থেকে কচু,হলুদ থেকে ডালিম,অশোক থেকে মানকচু,জয়ন্তী থেকে বেল,আর লক্ষ্মীস্বরূপা ধান তো আছেই,এই ন'টি উদ্ভিদ অপরাজিতা লতা আর হলুদরঙের সুতো দিয়ে বেঁধে পুজো করা হয়। এই পুজো আদতে কৃষিভিত্তিক সমাজে পৃথ্বীদেবীর পুজো পরম্পরা।

৫. মহাষ্টম্যাদি কল্প : এক্ষেত্রে প্রথমেই লক্ষণীয়,'অষ্টমী'র আগে 'মহা' শব্দটির অবস্থান। ষষ্ঠী বা সপ্তমীর আগে এই বিশেষণ বসেনি। অষ্টমী মহাষ্টমী, কারণ এদিনকার পুজো মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য। মহাবিপত্তারক এই পূজা অনুষ্ঠান।

৬. মহানবমী কল্প : এক্ষেত্রেও 'মহা' জুড়েছে 'নবমী'র আগে। কারণ, নবমীর পুজো 'মহাসম্পদ্দায়ক',প্রচুর সম্পত্তি প্রদান করে।

অর্থাৎ,প্রতিপদাদিকল্প অনুসারে,মহালয়া দুর্গোৎসবের পরিধিভুক্ত তিথি। এই শাস্ত্রসম্মত বিধিটি বেতারে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের চণ্ডী পাঠের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের বহু আগে সমাজসম্মত আচার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৩২২ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের কার্তিক সংখ্যার 'নারায়ণ' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। শিরোনাম 'শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব', লেখক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। ' নারায়ণ '- এর সম্পাদক তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। সেই প্রবন্ধে লেখা আছে, "দেবীপক্ষের পূর্বেই পিতৃপক্ষ...যাঁহারা শাক্ত,তাঁহারা... পিতৃপক্ষের নবমী তিথি হইতে... বোধন বসাইয়া থাকেন... নবম্যাদি কল্পকে সাক্ষী বোধন বলে, অর্থাৎ তিলাঞ্জলি পরিতৃপ্ত পিতৃগণ উপস্থিত থাকিয়া এই কল্পের সহায়তা করেন,তাঁহারা যেন দাঁড়াইয়া থাকিয়া কুণ্ডলিনী জাগরণের সুবিধা করিয়া দেন। বংশানুক্রমের প্রভাবে এ দেহ তো তাঁহাদেরই, তাঁহাদের পাপ পুণ্য দোষ গুণ এবং অন্য বিশিষ্টতা সকলই এ দেহে সূক্ষ্ম বা প্রকটভাবে বিরাজ করিতেছে,তাঁহারা উপস্থিত থাকিয়া বোধনের সহায়তা করিলে মা... দেহঘটে এবং বিশ্বঘটে স্বেচ্ছায় জাগিয়া বসেন, তিনি জাগিলে...সকল সাধ পূর্ণ হয়।... সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরমাত্মাস্বরূপের দর্শন হয়। এই জাগরণই দুর্গোৎসবের সাধনা, আসল পূজা, আসল আরাধনা। এই জাগরণ দেহভাণ্ডে এবং ব্রহ্মাণ্ডে ঘটে এবং পটে সাধন করিতে হয়।" এককথায়, পিতৃপক্ষ বলে দেবীপুজো শুরু করা যাবে না, এমন মত আদৌ শাস্ত্র অনুমোদিত নয়।বরং পিতৃপক্ষ থাকাকালীন দেবীর বোধন শাস্ত্র অনুমোদিত কর্ম।ইতিহাসেরও এই অনুমোদনের প্রতি প্রীতি পক্ষপাত স্পষ্ট। কলকাতায় দুর্গাপুজোর ইতিহাস তেমনটাই বলছে। কলকাতায় প্রথম শারদীয় দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয় সেই বছর, যে বছর পলাশির যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের পরাজয় ঘটল। ইংরেজরা জিতল সেই যুদ্ধে আর লর্ড ক্লাইভের প্রত্যক্ষ মদতে পলাশির জয়ের স্মারক উৎসব হিসেবে পালিত হল দুর্গাপুজো শোভাবাজারের রাজবাড়িতে।পুজো সংগঠনের দায়িত্বে ছিলেন নবকৃষ্ণ মুনশি। এর প্রায় ১১ বছর পর, ১৭৬৬ সালে তিনি 'মহারাজা বাহাদুর' হন। সেবার নবকৃষ্ণ দেবী পুজোর বোধন করেছিলেন মহালয়ার আগের নবমীতে। পুজো চলেছিল ১৫ দিন। এই ক'দিন প্রত্যেক সকালে চণ্ডী পাঠের আসর বসত। আর রাতে বসত নাচ-গান-মদের আসর।

সোজা কথায়, মহালয়াকে দুর্গাপুজো থেকে বিচ্ছিন্ন করার মতো বিষয়ে পুরাণ সমর্থন দেয় না বটে, তবে মহালয়ার আগেই দুর্গাপুজোর বোধনের ঘটনা শাস্ত্র ও ইতিহাস সমর্থন করে।

পলাশির যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের পরাজয় ঘটল। ইংরেজরা জিতল সেই যুদ্ধে আর লর্ড ক্লাইভের প্রত্যক্ষ মদতে পলাশির জয়ের স্মারক উৎসব হিসেবে পালিত হল দুর্গাপুজো শোভাবাজারের রাজবাড়িতে।

এর থেকে কী বোঝা গেল? সেই প্রশ্নের উত্তরও রয়েছে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লিখিত প্রবন্ধের একটি বাক্যে। পাঁচকড়ি লিখছেন, "খোশ খেয়ালের কাব্য জড়াইয়া এই মহামহোৎসবের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিলেই অজ্ঞতা এবং মূর্খতা আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিবে।"

মা দুর্গার 'ছানাপোনা' নিয়ে মর্ত্যে আগমনের সাক্ষী থাকতে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ভিড় ও সেই সূত্রে জ্যামজটের ট্র্যাডিশনটাও মোটেই অর্বাচীন কালের আদিখ্যেতা নয়। বরং দ্বিশতাধিক বর্ষের পুরোনো পরম্পরা। ১৮৩২-এর 'সমাচার চন্দ্রিকা' জানাচ্ছে, "গোপীমোহন ঠাকুর ও মহারাজা সুখময় রায়বাহাদুর ও বাবু নিমাইচরণ মল্লিক প্রভৃতির বাটীর সম্মুখে রাস্তায় প্রায় পূজায় তিন রাত্রিতে পদব্রজে লোকের গমনাগমন ভার ছিল যেহেতু ইংরেজ প্রভৃতি লোকের শকটাদির ও যানবাহনের বহুল বাহুল্যে পথরোধ হইত। "কলকাতার বড় বড় পুজো প্যান্ডেলের আশেপাশে চেনা যানজটের

সেপিয়া রঙে ছুপানো প্রাচীন চিত্র বই অন্য কিছু নয়।

একই রকম কথা, দুর্গাপুজোয় মদ্যপান কেতায় কিংবা ভাসানের সময় নাচ গান বেলেল্লাপনার মধ্যে শাস্ত্রীয় বিধির উল্লংঘন আশঙ্কার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১৯৩৩-এ 'ইয়ং বেঙ্গল' জানতে চেয়েছিল,দেশীয় বাবুরা প্রজা সাধারণের উন্নতিকল্পে ইংরেজ সাহেবদের সাহায্য না-নিয়ে দুর্গাপুজোয় তাঁদের মদ খাইয়ে, নাচ দেখিয়ে টাকা ওড়াচ্ছেন কেন? 'তাহারা কি সর্বসাধারণের উপকারযোগ্য কোন বিষয় দেখিতে পান না?'ঈশ্বরগুপ্তও এরকম 'সৎ' জিজ্ঞাসা তুলতে কার্পণ্য করেননি। তিনিও সরাসরি শুধিয়েছিলেন, "পূজাস্থলে কালীকৃষ্ণ শিবকৃষ্ণ যথা। ঈশু কৃষ্ণ নিবেদিত মদ্য কেন তথা।। রাখ মতি রাধাকান্ত রাধাকান্ত পদে। দেবীপূজা করি কেন টাকা ছাড় মদে।।"

'ভাসানযাত্রা'য় 'তাসা পার্টির কসরত' দেখানোর প্রসঙ্গ। এটিও বোধহয়,আর যাই হোক, অশাস্ত্রীয় জ্ঞানে বর্জ্য নয়। শাস্ত্রের বিধান,বিসর্জনের সময় দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি শবরোৎসবের আঙ্গিকে বিসর্জিত হবে। শাস্ত্রমতে, কাদা ছোঁড়াছুড়ি খেলা থেকে শুরু করে অশ্লীল নাচ, সবকিছুই ওই শবর উৎসবের অঙ্গ। আসলে দশমী, মুক্তিসুখে অবগাহনের দিন। 'যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রত চ' (শ্রীশ্রী চণ্ডী ৪/৯)। সেই মুক্তিসুখে লেপ্টে থাকে শবোরৎসব। অন্ত্যজ শবর সম্প্রদায়ের পালনযোগ্য উৎসব। স্মৃতিশাস্ত্র প্রণোদিত করছে, দেবীর নিরঞ্জন হয়ে যাওয়ার পর 'ভগলিঙ্গাভিধান'দিয়ে, অর্থাৎ অশ্লীল শব্দ সহযোগে,একে অন্যকে গালিগালাজ করার জন্য। সেইসঙ্গে সারা শরীর পাতা দিয়ে ঢেকে, সারা গায়ে কাদা

সবচেয়ে বিখ্যাত এবং সর্বাধিক পরিচিত সমীকরণ। সমীকরণটিতে ভর ও শক্তির মধ্যেকার এই পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। এই তত্ত্ব অনুসারে ভর সমপরিমাণ শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। যার সাধারণ মানে দাঁড়ায় ভর এবং শক্তি পরস্পরে রূপান্তরিত হতে পারে।এই সাম্য অনুযায়ী,ভর এবং শক্তি হল আন্তঃরূপান্তরযোগ্য। অন্য কথায়, ভর এবং শক্তি একই ভৌতসত্ত্বা এবং একে অপর রূপে পরিবর্তিত হতে পারে।

ভরের শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার উদাহরণ ভৌতবিজ্ঞানে বহু। এই সংক্রান্ত সর্বাধিক পরিচিত এবং বেদনাদায়ক উদাহরণটি হল হিরোশিমা-নাগাসাকিতে ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৮ আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেলা পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা। পারমাণবিক বোমাতে একটি বড় মৌলের পরমাণুকে (যেমন ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম) নিউট্রন দ্বারা আঘাত করেভেঙে ফেলা হয়। ফলে বড় পরমাণুটিভেঙে দুটি নতুন পরমাণুতে বিভক্ত হয় এবং কিছু ভর পরিণত হয় শক্তিতে। কিন্তু শক্তির ভরে রূপান্তরিত হওয়ার উদাহরণ আমাদের চারপাশে বড় একটা নেই।

এই প্রেক্ষিতে দেবতাদের পুঞ্জীভূত তেজ ঘনীভূত ভর হিসেবে দুর্গার আবির্ভাব শক্তির ভরে পরিণত হওয়ার দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য হতে পারে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের এই কাহিনী $E = mc^2$ প্রচারিত হওয়ার বহু শতাব্দী আগে ঋষি হৃদয়ে, ভাবনেত্রে পরিস্ফুটহয়ে গিয়েছিল।

১৯০১ সালে বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গাপুজোর সময় প্রতিমা নিরঞ্জনের আগে স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বয়ং দেবী প্রতিমার সামনে ভাবের ঘোরে নেচে উঠেছিলেন। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য উপভোগ করেছিলেন স্বয়ং বিবেকানন্দ।

মেখে নাচ গান করতে। যে এরকম করবে না, যে এসবে অংশ নেবে না, তারা দেবীর 'বিরাগভাজন' হবে, একথাও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। অর্থাৎসামাজিক শ্রেণি বিন্যাসে তুমি যে স্তরেই বিরাজ কর, দশমীর দিন বিসর্জন শেষে উচ্চ বর্ণীয়দের ডি ক্লাস হতেই হবে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে।

সেজন্যই বোধহয় ১৯০১ সালে বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গাপুজোর সময় প্রতিমা নিরঞ্জনের আগে স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বয়ং দেবী প্রতিমার সামনে ভাবের ঘোরে নেচে উঠেছিলেন। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য উপভোগ করেছিলেন স্বয়ং বিবেকানন্দ। আর আজও বেলুড় মঠের সাধুরা প্রতিমা বিসর্জনের সময় টুইস্ট নেচে নেন। তাসা পার্টির কসরতও এই ধারারই আধুনিক প্রকাশ, এটা অস্বীকার করব কোন যুক্তিতে?

দেবী দুর্গার সৃষ্টিতে আসলে লুকিয়ে আছে পদার্থবিদ্যার একটি সূত্র। পদার্থ বিজ্ঞান অনুসারে, বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের একটি উল্লেখযোগ্য ফলাফল হচ্ছে ভর ও শক্তিকে অভিন্নরূপে দেখা। ভরেরসঙ্গে যেমন শক্তি জড়িত,তেমনি শক্তিরসঙ্গে ভর জড়িত। অর্থাৎ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে ভর ও শক্তিকে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ বলে প্রমাণ করা যায়। $E= mc^2$ আইনস্টাইনের

পরিশেষে বলি, দেবী দুর্গা কোনও দুর্জ্ঞেয় বিষয় নন। বরং দুর্গা তত্ত্ব এমন একটি বিষয় যা অন্ধের কাছেও পরিস্ফুট হয় বিনা বাধায়। এ এক ঐতিহাসিক সত্য।

১০৭১ বঙ্গাব্দ। ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দ। পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার আটিয়া পরগনার কাটালিয়া গ্রাম। নয়নকৃষ্ণ রায়ের ছেলে ভবানীপ্রসাদ। বৈদ্য বংশের জন্মান্ধ সন্তান। ছেলেবেলাতেই বাপ-মা'কে হারিয়ে অনাথ। পারিবারিক পদবি ছিল 'কর'। কিন্তু বাবার মতো নয়নকৃষ্ণের জন্মান্ধ ছেলেও ব্যবহার করে 'রায়' উপাধি।মা-বাবার মৃত্যুর পর থেকেই তুতো-ভাই কাশীনাথের আশ্রিত সে। কাশীনাথের দুই ছেলে। দুজনেই কাকাটির ওপর অত্যাচার চালায়। ছোট ভাইপোর পর-নারী আর পর-দ্রব্যের প্রতি টান অনেকটা বেশি। ভবানীপ্রসাদের ওপর নির্যাতনের বহরও। ভবানীপ্রসাদ জন্মান্ধ বলে অক্ষর পরিচয়ের সুযোগ পায়নি। তাই সে নিরক্ষর। তা বলে মূর্খ নয়। মুখে মুখে,শুনে শুনে সে শিখে নিয়েছে পুরাণ।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর শ্লোক তার মনে বাজে। তাই অক্ষরজ্ঞানহীন দৃষ্টিশক্তিহীন কবি অক্লেশে লিখে ফেলেন, "তুমি স্বাহা তুমি স্বধা তুমি বষটকার। তুমি মেধা তুমি মাত্রা তুমি সে আকার।।" একেবারে শ্রীশ্রী চণ্ডীর ৭৩ নং শ্লোকের ভাবানুবাদ। শ্রীশ্রী চণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ের ৭৩ নং শ্লোক।

"ত্বং স্বহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষটকারঃ স্বরাত্মিকা। সুধা তমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা।।" অষ্টমীর সকাল। দুর্গাপুজোর মণ্ডপে মণ্ডপে নতুন জামা-কাপড়ের গন্ধ। ফুল বেলপাতা হাতে স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ দেবীকে অঞ্জলি প্রদান করছেন ভক্তিভরে। সম্মিলিত কণ্ঠে পুরোহিতকে অনুসরণ করে অনুরণিত হচ্ছে সেই চিরচেনা মন্ত্র, "সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমো'স্তুতে।। সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানং শক্তিভূতে সনাতনী। গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমো'স্তুতে।। শরণাগতদীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে। সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমো'স্তুতে।। "শ্রীশ্রী চণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ে নারায়ণীস্তুতির ১০-১২ নং শ্লোক।

অন্ধ কবিও কানে শুনেছেন সেই শ্লোক। সেটিকে জারিত করেছেন অনুভবের রসে। তারপর তাঁর বঙ্গানুবাদে আলপনা এঁকেছে ভাবের সহজিয়া ছন্দ। "সর্বমঙ্গলা রূপে তুমি কল্যাণদায়িনী। শিবারূপে চতুর্বর্গ ফল প্রদায়িনী। সৃষ্টিস্থিতি উৎপত্তি পালন যাহার। শক্তিরূপে রচ তুমি মূল সবাকার।। শরণাগতের দুঃখ খণ্ডন কারণ। পরিত্রাণ কর তুমি হৈয়া পরায়ণ।।"

এই অধ্যায়েই ইন্দ্রসহ দেবতারা উচ্চারণ করেছেন স্তোত্র, "সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তি সমন্বিতে। ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমো'স্তুতে।।" ভবানীপ্রসাদও তখন কাতরভাবে প্রণতি জ্ঞাপন করেছেন, বাংলা ভাষায়, সংস্কৃতের জটা ছাড়ানো সারল্যে। "সর্বস্বরূপা তুমি সর্বদেবময়ী। আদ্যারূপা জীবে বাস করহ নিশ্চএ।। সর্বশক্তিময়ী তুমি সর্বত্রসমান। সেহি মায়া-মোহে জীব নাহি অন্য জ্ঞান।।"

১৩০৩ বঙ্গাব্দের ২৯ ভাদ্র। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনের বক্তৃতা দিতে উঠলেন রসিকচন্দ্র বসু। আর তাঁর আলোচনাতেই প্রথম উঠে এল 'দুর্গামঙ্গল' প্রসঙ্গ। ভবানীপ্রসাদ রায়ের কাব্য। কাব্যটির যে পুঁথি উদ্ধার হয়েছিল তাতে লেখা ছিল রচনাকাল।

"চন্দ্র মুনি * * আর দিক নিয়া সাথে।
রচিল পুস্তক রায় প্রকাশ কবিতে।।"

এই কালনির্ণায়ক দ্বিপদীর প্রথম চরণেই দুটি বর্ণ কীটদষ্ট। পড়া যাচ্ছে না। রসিকচন্দ্র বসু পোকায় কাটা বর্ণদুটিকে 'দশ' ধরে নিয়ে রচনাকাল ১০৭১ (দশ দিক, সপ্ত ঋষি আর এক চন্দ্রের সমাহার) অব্দ নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু ১০৭১ কী, বঙ্গাব্দ, না শকাব্দ, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেননি। তাঁর এই না-পারাটাকেই চ্যালেঞ্জ করেছেন 'দুর্গামঙ্গল'-এর সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তফী। তিনি বলেছেন, 'দশ দিক'ই যে হতে হবে, তা তো আর নিশ্চিত করে বলা যায় না। পোকায়

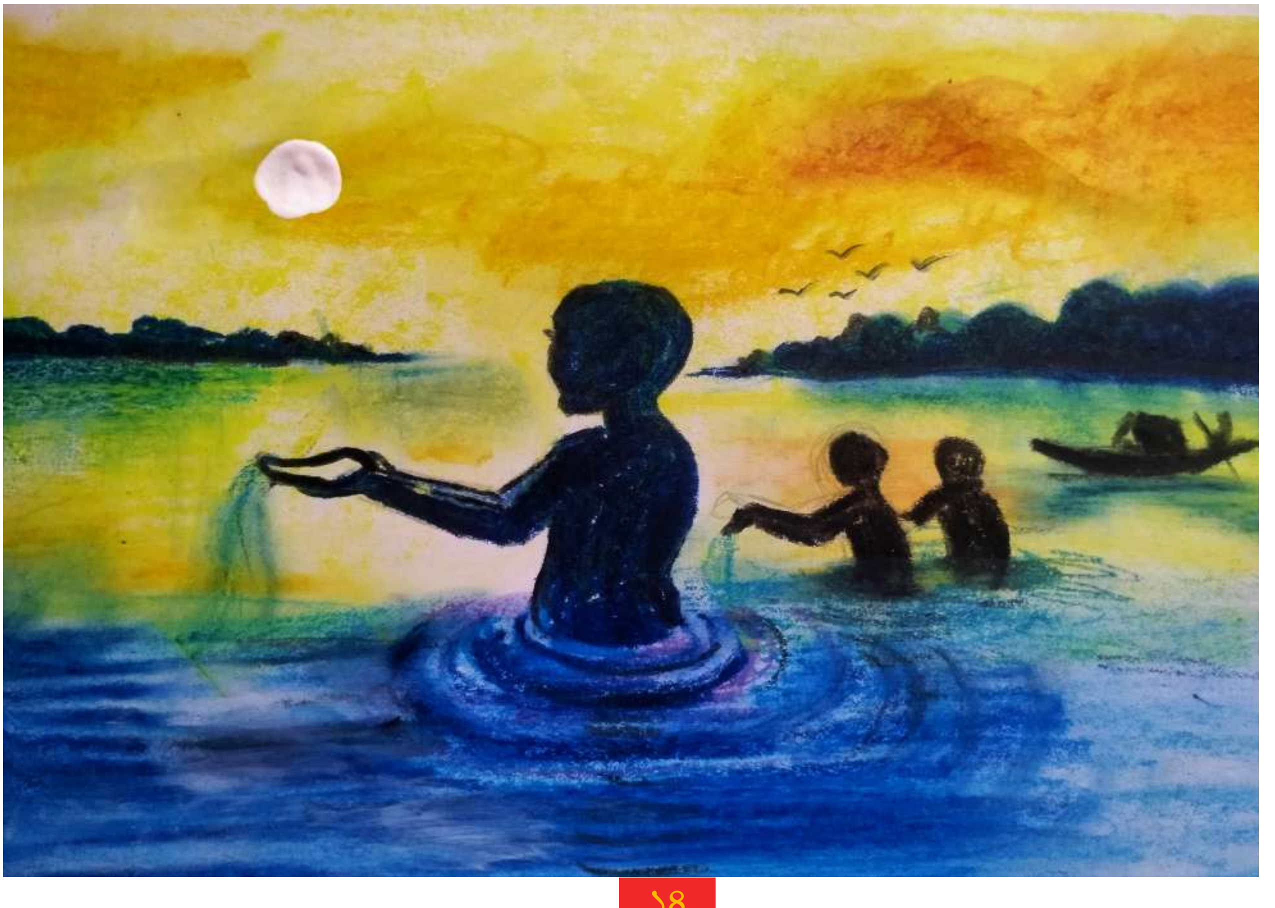

কাটা জায়গাটায় 'চার' শব্দটাও তো থাকতে পারত। তাহলে ১০৭১ বদলে যেত ১৪৭১-এ। এইভাবে 'দুর্গামঙ্গল'-এর রচনাকাল ১৪৭১ শকাব্দ, এমনটাই অভিমত ব্যোমকেশ মুস্তফীর। সেক্ষেত্রে ভবানীপ্রসাদ চৈতন্যযুগের প্রথম শতাব্দীর লোক।

রচনাকাল যাই হোক না কেন, জন্মান্ধ কবির পক্ষে শ্রীশ্রী চণ্ডী সামনে খুলে বসে তার অনুবাদ করতে বসা সম্ভব ছিল না। তিনি তা করেনওনি। চোখে দেখতে না পেলেও স্রেফ শুনে শুনে শাস্ত্র-পুরাণের নানা বিষয় তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল। 'দুর্গামঙ্গল' লেখার সময় সেই মনোলোকটাই তাঁর দৃষ্টি-প্রতিবন্ধকতা খর্ব করেছিল। ব্যোমকেশ মুস্তফীর ভাষায়, "শুনিয়া শুনিয়া তিনি যে সকল শাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মনে সর্বদা জাগরুক থাকিত এবং বুদ্ধিবলে তিনি প্রয়োজনমতো আবশ্যকীয় স্থলে তাহাদের প্রয়োগ করিতে পারিতেন।"

এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ সম্ভবত ভগবান শ্রীহরির পশুরাজ হরির রূপ ধারণ বৃত্তান্ত। এ কাহিনি, শ্রীশ্রী চণ্ডী যার অংশবিশেষ, সেই 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ'-এর নয়। এটি মৎস্য পুরাণের কাহিনি। এবং সে কথাটি জন্মান্ধ নিরক্ষর কবিবর স্বয়ং আমাদের জানিয়েছেন।

"ভগবতী বোলে হরি অবধান কর। যুদ্ধকামে পৃথিবী লহ সবে মোর ভর।। পদভরে পৃথিবী হইবে রসাতল। কি মতে অসুর সঙ্গে কবির সমর।। ধরিবারে আমাদের পারহ কোন জন। অসুর বধিতে পারি করিয়া সংগ্রাম।। এতেক শুনিয়া তবে

জানা সম্ভব নয়। রামকে দুর্গাপুজোর আচার-উপাচার জানাতে গিয়ে অগস্ত্য তুললেন মেধস মুনির আশ্রমে রাজা সুরথ আর বৈশ্য সমাধির প্রসঙ্গ। জানালেন, কীভাবে সুরথ রাজা দেবীপূজা করে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করেছিলেন। সেই সূত্রেই মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রী চণ্ডী অনূদিত হয়ে ঢুকে পড়ল কৃত্তিবাসী রামায়ণের অকাল বোধনের কাহিনির পরিসরে।

কাহিনি বিন্যাসে মৌলিকত্ব শুধু এটুকুতেই সীমায়িত নয়। মোচড় অন্যত্র। পূজা অন্তে রাম যখন সশরীরে আবির্ভূতা দেবীর কাছে রাবণ-নিধনের বর প্রার্থনা করলেন, তখন দেবী, ভবানীপ্রসাদের 'দুর্গামঙ্গল'-এ বলেন, তাঁর প্রিয় ভক্ত রাবণ কঠোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে ভুবন বিজয়ী বীর হয়েছেন। সুতরাং 'তাহাকে জিনিতে আমি কিমতে দিব বর।'রামচন্দ্র দেবীর অসহায়তাটা বুঝেছেন। এবং বলেছেন, "আর বরে নাহি প্রয়োজন। নিশ্চয় বধিব আমি লঙ্কার রাবণ।।"এ একেবারে আম-বাঙালির মনোলোকের প্রতিফলন। পূর্ণ দৈবনির্ভরতা নয়, বরং দেবতার প্রতি নিরবচ্ছিন্ন ভক্তির সমান্তরালে আত্মনির্ভরতায় আস্থা জ্ঞাপন। একেবারে 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা', বরং 'দুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা', সেদিন ঈশ্বরের প্রতি সংশয়াতীত ভক্তি অটুট রাখার শপথ। কৃত্তিবাসের দেবনির্ভর, অলৌকিকতার ভিখারি রাম ভবানীপ্রসাদের কাব্যে ভক্তিমান অথচ প্রত্যয়ী পুরুষাকারের প্রতিভূ। দৈবে ভক্তি অটুট রেখেই বারুদ শুকনো রাখার বাস্তব বোধে সম্পৃক্তি।

"ভগবতী বোলে হরি অবধান কর। যুদ্ধকামে পৃথিবী লহ সবে মোর ভর।। পদভরে পৃথিবী হইবে রসাতল। কি মতে অসুর সঙ্গে কবির সমর। ধরিবারে আমাদের পারহ কোন জন। অসুর বধিতে পারি করিয়া সংগ্রাম।

বোলেন শ্রীহরি। অবশ্য ধরিব আমি সিংহমূর্তি ধরি।। এ বোলিয়া সিংহমূর্তি ধরিলা নারায়ণ। বক্রনখ দন্ত হৈল বিকটভূষণ।। শটাতে নক্ষত্রলোক করয়ে বিদার। মহা পরাক্রম বীর কি কহিব আর।। এহিমতে ঐরিমূর্তি করিলা প্রচার। মৎস্যপুরাণে আছে ইহার বিস্তার।।"

'দুর্গামঙ্গল' কাব্যের আরম্ভটাও কিন্তু মোটেই মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত 'শ্রীশ্রী চণ্ডী'র অনুসারী নয়। ভবানীপ্রসাদ তাঁর কাব্য শুরু করেছেন শ্রীরামচন্দ্রের কথা দিয়ে। সমুদ্র লঙ্ঘনে অসমর্থ বানরসেনারা। অথচ সাগর পেরিয়ে লঙ্কায় না পৌঁছাতে পারলে সীতা-উদ্ধার সম্ভব নয়। তখন জাম্বুবানের পরামর্শে রামচন্দ্র ডেকে পাঠালেন অগস্ত্য মুনিকে। অগস্ত্য এর আগে একবার এক অঞ্জলিতে সমুদ্রের সমস্ত জল পান করেছিলেন। এবার আর সেকাজ করতে রাজি হলেন না। বললেন, "পুনঃ পুনঃ নীর পান উচিত না হয়। অপরাধ বিনে কিছু পুণ্য নাশ হয়।।"সেই সঙ্গে পরামর্শ দিলেন, অম্বিকা পূজার। "পরাৎপর পরব্রহ্মা দেবী মহাশয়া। ভজহ ভবানী-পদ ঐকান্তিক হৈয়া।। করিলে অম্বিকা পূজা সর্বাসিদ্ধি হয়। হেলায় বান্ধিবে সেতু লঙ্কা হবে জয়।।"রাম তখন জানতে চাইলেন দেবী পূজার বিধান। ক্ষত্রিয় তিনি। তাই দুর্গাপুজোর আচার-উপাচার তাঁর পক্ষে

আসলে, জন্ম ইস্তক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ভবানীপ্রসাদ ভাইপোদের হাতে নিগৃহীত হতে হতেও আস্থা রেখেছিলেন নিজের আন্তরসত্তার ওপর, তাবলে ঐশ্বরিক কৃপা প্রার্থনায় যতি টানেননি। অন্ধত্ব ও নিরক্ষরতা সত্ত্বেও কাব্য রচনা করেছেন নিজের মনোবলে, আবার সেই কাব্য-আখরেই উজাড় করে দিয়েছেন তাঁর অকুণ্ঠিত দৈব নির্ভরতা।

ভবানীপ্রসাদ বলে ভবানীর পায়।
জন্ম অন্ধ ভগবতি কৈয়াছ আমায়।।
এ জনমের মত মোর নহিবে মোচন।
কৃপা করি আসি অন্ধে কর পরিত্রাণ।।

দৈবপ্রসাদে দুর্ভাগ্য অতিক্রম অসম্ভব জেনেও যে যুক্তিবাদী বাঙালি আমাদের মতো প্রতি বছর মণ্ডপে মণ্ডপে অবিচল আস্থা জ্ঞাপন করে দুর্গার দুর্গতিহরণ ক্ষমতায়, ভবানীপ্রসাদ যেন তাদেরই প্রতিনিধি। আমাদের চির চাওয়া তো একটাই:

"সংসারার্ণবে দুষ্পারে সর্বাসুখবিনাশিনী।
ত্রায়স্ব বরদে দেবী নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে।।"

তুলিকলা: নেহা করন

তুলিকলা: রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়

পুজোর ঢাক এবং একটি প্রেম

প্রচেত গুপ্ত

সম সময়ের বিশিষ্ট সাহিত্যিক। জন্ম ১৪ অক্টোবর, ১৯৬২। অর্থনীতিতে স্নাতক। প্রথম উপন্যাস 'আমার যা আছে'। বইয়ের সংখ্যা পৌনে একশোরও বেশি। গল্প-উপন্যাস নিয়ে টেলিফিল্ম, সিনেমা হয়েছে। লেখকের কথায়, 'চকিতে সবকিছু থেকে, সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। ভিতরে হাহাকার জাগে। ভূতগ্রস্তের মতো লিখতে বসি। বুঝি, এইটাই আমি।' বাল-সাহিত্য অকাদেমি সহ বহু পুরস্কারে ভূষিত। কিছু গল্প হিন্দি, ওড়িয়া, মারাঠি ভাষায় অনূদিত।

প্রথমেই বলে রাখি, এই গল্প চেনা লাগতে পারে। কেউ ভাবতে পারেন, এই গল্প আগে পড়েছি। কেউ ভাবতে পারে, এই গল্প আগে শুনেছি। কেউ ভাবতে পারে, এই গল্প আগে দেখেছি। আবার এমনও হতে পারে, কেউ ভাবতে পারে, 'আরে! এ তো আমার গল্প।' যে যা ভাববে, তাই সত্যি। কারণ এই গল্প সবসময় সত্যি।

এবার শুরু করা যাক—

দরজা খুলেই মায়ের চোখ কপালে। তারপর একেবারে স্ট্যাচু। মনে হচ্ছে, ভয় পেয়েছে।

আমি বললাম, 'কী হল মা? সরে দাঁড়াও, ঘরে ঢুকতে দাও।'

মা বিড়বিড় করে বলল, 'তোর কাঁধে ওটা কী পর্ণা?'

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, 'দেখতে পাচ্ছ না কী?'

মা বিস্ফারিত চোখে বলল, 'না, দেখতে পাচ্ছি না। কাঁধে করে বাড়িতে কী নিয়ে এসেছিস!'

এবার আমি হেসে ফেললাম। বললাম, 'বন্দুক। একে ফর্টি সেভেন। ঠাই ঠাই ঠাই ঠাইইই।'

মা কড়া গলায় বলল, 'পর্ণা, ঠাট্টা করবি না। আগে বল...আগে বল ওটা কী।'

আর কতক্ষণ ফ্ল্যাটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব? আমার মা এমনিতেই একজন হতভম্ব টাইপ মহিলা। একটু অন্যরকম কিছু দেখলেই হল। মেয়ের কাঁধে এই জিনিস দেখলে তো হবেই। আমি মাকে সরিয়ে ঘরে ঢুকলাম।কাঁধের জিনিসটা কার্পেটের ওপর রেখে ধপ করে সোফায় বসলাম।

'এবার চিনতেপারছ?'

মা দরজা আটকে থমথমে গলায় বলল, 'না পারছি না।'

আমি বললাম, 'তুমি ঢাক চেনো না ? পুজোরপ্যান্ডেলে বাজানো হয়, কাই নাড়া কাই নাড়া, গিজগিনিতা গিজগিনিতা। শোনওনি কখনও? এটা সেই ঢাক।'

মা চোখ পাকিয়ে বলল,'তুই ঢাক দিয়ে কী করবি?'

আমি সোফায় হেলান দিয়ে বললাম, 'ঢাকের কার্যকারিতা ওয়ান অ্যান্ড ওনলি ওয়ান। তা হল বাজানো। এই ঢাক আমি এবার আমাদের হাউজিং-এর পুজোপ্যান্ডেলে বাজাব।'

মায়ের চোখ বড় হয়ে গেল। বলল, 'সন্ধেবেলা তুই একটা ঢাক কাঁধে করে ল্যাবরেটরি থেকে বাড়ি ফিরলি!'

পা নাড়াতে নাড়াতে আমি বললাম, 'সমস্যা কী মা? কাঁধে করে ল্যাপটপ আনা যায়, কাঁধে করে গিটার আনা যায়, কাঁধে করে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্রছাত্রীরা ড্রইং চার্টের পাইপ, টি-স্কোয়ার নিতে পারে আর একটা ঢাক নিলেই দোষ? ঢাক তো কাঁধেই থাকে মা। তার জন্মই তো কাঁধে থাকার জন্য।'

মা ধপাস করে উল্টোদিকের মোড়ায় বসে পড়ল। ঢাকটার দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন ঢাক নয়, আমাদের ফ্ল্যাটের ড্রইংরুমে একটা পেটমোটা ভল্লুক ঢুকে পড়েছে। মায়ের সামনে উবু হয়ে বসে আছে। মা কখন বাটি করে মধু খেতে দেবে।

'পর্ণা, একটা মেয়ে হয়ে তুই পুজোপ্যান্ডেলে ঢাক বাজাবি?'

আমি চুলের ক্লিপ খুলতে খুলতে বললাম, 'সমস্যা কী? মেয়েরা প্লেন চালাচ্ছে, ঢাক বাজাতে পারবে না কেন? তুমি খবরের কাগজে মহিলা ঢাকিদের ছবি দেখনি?'

মা এবার হতভম্ব ভাব কাটিয়ে রেগে গেল। কড়া গলায় বলল, 'তুই কি মহিলা ঢাকি হবি? মহিলা ঢাকি হওয়ার জন্য এত লেখপড়া শিখেছিস? সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে রিসার্চ অ্যাসিসটেন্টের কাজ করছিস? মনে রাখিস, তোর মোটে তেইশ বছর তিন মাস বয়েস। যা খুশি করতে পারিস না।'

আমি শান্ত গলায় বললাম, 'বি কুল মা। শান্ত হও। তুমি বরং আমার ঢাক বাজানো শোনো। দেখ তালে ভুল হচ্ছে কিনা।'

ব্যাগপ্যাকের চেন খুলে দুটো ঢাকের কাঠি বের করলাম। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ঢাকে মারতে শুরু করলাম। কাই নাড়া কাই নাড়া গিজগিনিতা গিজগিনিতা...।'

মাও উঠে দঁড়িয়ে 'হাঁই হাঁই' করে উঠল, 'করিস কী! ফ্ল্যাটে ঢাক বাজাচ্ছিস!'

স্বপ্নের এই পর্বে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

মাথার কাছের জানলা দিয়ে শরতের নরম রোদ আর হাউজিং-এর প্যান্ডেল থেকে ঢাকের আওয়াজ ঘরে ঢুকছে।দুর্গাপুজো শুরু হয়ে গেল। ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। আজ ষষ্ঠী। ষষ্ঠীর সকালে ঢাকের স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙল। এই স্বপ্নের কথা যে শুনবে সে-ই বলবে এটা যেমন মজার স্বপ্ন, তেমন একটা জম্পেশ কো-ইনসিডেন্স। কচু। দুটোর একটাও নয়। ঘটনা কো-ইনসিডেন্স যেমন নয়, তেমন মজারও নয়। গত কদিন ধরে আমি ঢাক নিয়ে ভাবনাচিন্তার মধ্যে রয়েছি। এমনি ভাবনা চিন্তা নয়, রাগের ভাবনাচিন্তা। ঢাকের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার ভাবনাচিন্তা। আমি নিশ্চিত, সেই কারণে কাঁধে ঢাক নিয়ে বাড়ি আসার স্বপ্ন দেখেছি। আর এই যে এখন ঢাকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি সেই আওয়াজ যতই মিষ্টি হোক, সেই আওয়াজের জন্য যতই সারাবছর অপেক্ষা করে থাকি, আমার কিন্তু গা জ্বলছে। ঢাক নিয়ে খুব দ্রুত আমাকে একটা কিছু ডিশিসনে পৌঁছোতে

হবে। এসপার ওসপার ধরনের ডিশিসন। কুইক, ভেরি কুইক। হাতে সময় বেশি নেই।

বিছানা থেকে নেমে পড়লাম। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে প্যান্ডেলে যেতে হবে। আমাদের হাউজিং-এর এটাই নিয়ম। ষষ্ঠীর দিন সকালে সবাই একবার প্যান্ডেলে মিট করবে। খুব মজা হয়। সেই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। মা দরজায় টোকা দিল।

'পর্ণা, তাঁতের শাড়িটা পরে প্যান্ডেলে যাবি।'

চিৎকার করে বললাম, 'খেপেছ? ওসব শাড়িটাড়িতে আমি নেই। আমি এখন যা পরে আছি সেই শর্টস আর গেঞ্জি পরেই যাব।'

মা চিৎকার করছে। করুক। ততক্ষণে মুখ ধুতে ধুতে ঢাক নিয়ে আমার রাগারাগির ঘটনা বলে ফেলি। আমাদের এই হাউজিং-এর সি ব্লকে থাকে মাদল। আমার বয়সী। ছোটবেলা থেকে মিশে আসছি। সেই সময়ে এই ছেলেকে পাজি, রামবিচ্ছু বললে কম বলা হত। বলা উচিত 'কানমলা ছেলে'। দেখলেই কান মুলে দিতে ইচ্ছে করত। স্কুলজীবন পর্যন্ত একসঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলেছি, পিকনিক করেছি, পুজোয় নাটক করেছি। হইচই করেছি খুব। ঝগড়াও হয়েছে বিস্তর। আমি ছিলাম ওর জ্বালাতনের টার্গেট। খুব পেছনে লাগত। কখনও বিনুনিতে চুংইগাম লাগিয়ে দিচ্ছে, কখনও দোলের দিন মুখে রং দিয়ে দিল, কখনও খেলতে গিয়ে চোট্টামি করেছে। এই কারণে আমি মাদলের সঙ্গে মারপিটও করেছি অনেক। হাউজিং-এর সবাই জানে, পর্ণা আর মাদলের সম্পর্ক হল সাপ অ্যান্ড নেউল রিলেশন। তবে ছেলেটার দুটো মস্ত গুণ। লেখাপড়ায় খুব মাথা। আর সেই কমবয়স থেকেই মানুষের উপকার করে বেড়ায়। বন্ধুদের কারও বিপদ হলে মাদলকে পাশে পাওয়া যাবেই যাবে। সেই মাদল স্কুল শেষ করে আইআইটিতে পড়তে চলে গেল কানপুর। প্রথমে বছরে তিনবার করে আসত। তারপর দু'বার। এখন একবার আসে। ওখানেই রিসার্চ করছে। বিদেশে গেল বলে। এখন আসে পুজোর সময়।আমার সঙ্গে হোয়াটস্‌অ্যাপে, ফেসবুকে যোগাযোগ। তবে কম। আমরা দুজনেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। তাছাড়া এই ছেলে আমার কাছে অতি অসহ্য। বেশি কথা বললেই একটু পরে ঝগড়া লেগে যায়।

মাদল গতবার পুজোর সময়ে এসে এক কাণ্ড করল।

নবমীর সন্ধেবেলা আমাকে প্যান্ডেলের একপাশে ডেকে নিচু গলায় বলল...। প্যান্ডেলে তখন তারস্বরে ঢাক বাজছে। কাই নাড়া কাই নাড়া, গিজগিনিতা গিজগিনিতা...।' আমি খুব রেগে গেলাম। বললাম, 'তোর সঙ্গে! অসম্ভব।' মাদল মুচকি হেসে বলল, 'তাড়াহুড়ো করতে হবে না, সময় নে, একবছর সময় নে। পরের নবমীতে ঠিক এই সন্ধেবেলা জানাবি। ইয়েস অর নো। সেদিনও আজকের মতো ব্যাকগ্রাউন্ডে ঢাকের বাদ্যি থাকবে।'

আমি বললাম, 'সময় লাগবে না। এখনই বলছি ইটস্ ইমপসিবল্।'

মাদল নির্বিকার ভাবে বলল, 'তাও ভাব। এই এক বছরে আমি তোকে আর বিরক্ত করব না। ওয়েট করব।

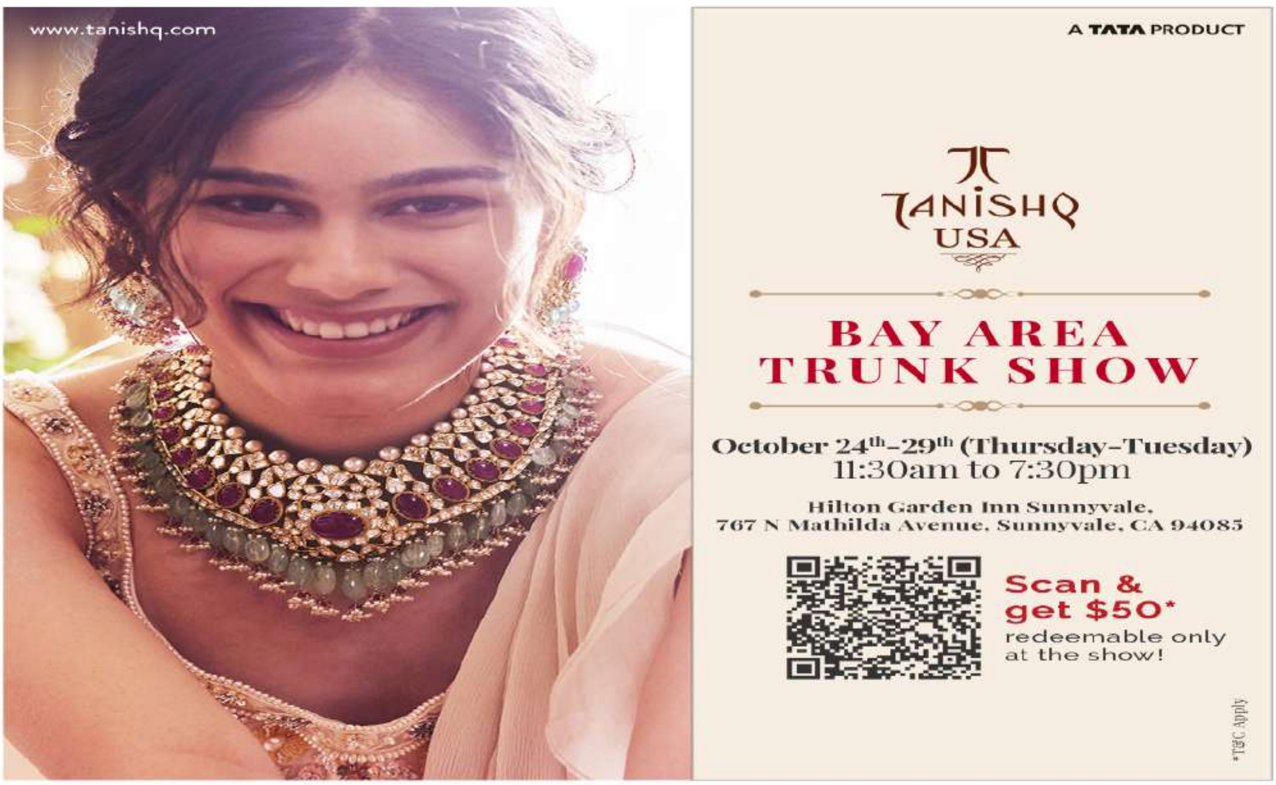

দেখা হবে ঢাকের আওয়াজে।'

সত্যি, এক বছর আমার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখেনি মাদল। আমিও চেষ্টা করিনি। গতকাল দেখা হল হাউজিং-এর গেটে।

বললাম, 'কবে এলি?'

মাদল বলল, 'কাল বিকেলে। দশমীর দিন কেটে যাব। তুই আছিস কেমন?'

আমি বললাম,'খুব ভালো। তুই যোগাযোগ করে বিরক্ত করিস না বলে বেশি ভালো।'

মাদল লজ্জা পাওয়া গলায় বলল, 'গতবার বিরক্ত করেছি বলে সরি।'

আমি একথায় পাত্তা না দিয়ে গম্ভীর গলায় বললাম, 'নবমীর দিনসন্ধেবেলা দেখা করবি। কথা আছে।'

মাদল বলল, 'অসম্ভব, ইমপসিবল। এবার নবমী এখানে ধুনুচি নাচের কম্পিটিশন। আমি ঢাক বাজাব। হাউজিং পুজো কমিটির কাছে আমি মেইল করেছিলাম। ওরা রাজি হয়েছে। আমি আধঘণ্টা টাইম পেয়েছি।'

আমি চোখ বড় করে বললাম, 'ঢাক বাজাবি! মানে কী? তুই কি আইআইটিতে ঢাক বাজানো শিখতে গিয়েছিলি?'

মাদল হাসল। বলল, 'কেন ছোটবেলাতেও তো এখানে ঢাকি কাকুদের কাছে থেকে স্টিক চেয়ে বাজাতাম। ভুলে গেলি? যাই হোক, নবমীর সন্ধেতে নো টাইম।'

আমি চুপ করে চলে গেলাম বটে, কিন্তু মাথায় আগুন ধরে গেল। আমার তো নবমীর সন্ধেতেই এই বিচ্ছু ছেলেকে চাই। এক বছর অপেক্ষা করে আছি নবমীর জন্য। এর মাঝখানে কোথা থেকে ঢাক এসে হাজির হল রে! নিশ্চয় মাদল ইচ্ছে করে এটা করেছে। দাঁড়াও ওর ঢাক নিয়ে আদিখ্যেতা বের করছি। কিন্তু কীভাবে?

কীভাবে? মাথায় এল নবমীর দিন বিকেলে। আমি আমাদের পুজোকমিটির অফিসে ছুটলাম। যে করেই হোক রাজি করাতে হবে। যাওয়ার আগে মাকে বললাম, 'তোমার নতুন লালপাড় শাড়িটা বের করে রাখবে। আজ সন্ধেতে লাগবে।'

অ্যাট লাস্ট আমি ঢাকের প্রতিশোধ নিয়েছি। বিচ্ছু মাদলকে আমার যা বলার বলেছি। বলেছি ঠিক নবমীর সন্ধে বেলাতেই। যেমনটা কথা ছিল। পিছনে ছিল ঢাকের বাদ্যি। কাই নাড়া কাই নাড়া, গিজগিনিতা গিজগিনিতা...। মাদল তখন ঢাকে কাঠি পেটাচ্ছিল।

'একী! পর্ণা তুই!'

আমি দু'হাতে ধুনুচি নিয়ে নাচতে নাচতে বললাম,'কেন আমি ধুনুচি নাচের কম্পিটিশনে নাম দিতে পারি না?'

মাদল বলল,'আমাকে তো আগে বলিসনি!'

ঢাকের তালে তালে পা ফেলে বললাম, 'তুই বলেছিলি যে ঢাক বাজাবি? কেমন জব্দ হলি? ও কথা ছাড়। শুনে রাখ, গত বছর তুই জানতে চেয়েছিলি...ইয়েস আমি রাজি। রাজি, রাজি, রাজি। একবছরে বুঝলাম তোকে ছাড়া ইমপসিবল্।'

মাদল কাঁধে ঝোলানো ঢাকে জোরে জোরে কাঠিমেরেবলল,'সত্যি? সত্যি পর্ণা? তুই রাজি?'

আমি পরেছি লালপাড় শাড়ি। কোমরে গুঁজেছি আঁচল। চুলে জড়িয়েছি ফুলের মালা। বললাম, 'অবশ্যই সত্যি। তোর সঙ্গে আরও অনেক মারপিট বাকি আছে না? এখন মন দিয়ে বাজা। তাল কেটে গেলে চলবে না।'

আমাদের দুজনের এই কথা আর কি কেউ শুনতে পেল? না, পেল না। পাবে কী করে? তখন ঢাক বাজছে যে। কাই নাড়া, কাই নাড়া, গিজগিনিতা গিজগিনিতা...।

তুলকলা: শ্রীতমা রক্ষিত

তুলিকলাঃ রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়

কৃষ্ণচূড়া

সিজার বাগচী

কলেজ জীবন থেকে লেখালেখি।আড়াই দশকেরও বেশি সাংবাদিকতার পেশায়। বর্তমানে 'আনন্দমেলা' পত্রিকার সম্পাদক। গল্প, উপন্যাস ছাড়াও কলমে আসে নিবন্ধ, প্রচ্ছদ কাহিনি, চিত্রনাট্য, ভ্রমণকাহিনি, কথিকা প্রভৃতি।গ্রন্থ সম্পাদনা সহ করেছেন ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ।বাংলা আকাদেমির সোমেন চন্দ স্মারক সম্মান, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইলা চন্দ সহ বহু পুরস্কারে ভূষিত।

বেলানগর রেলগেট পেরিয়ে বাঁ দিকে গাড়ি ঘোরাল ঋক। সামনের রাস্তা আশ্রমের পাশ দিয়ে সোজা চলে গেছে। কিছুটা গিয়ে ডান দিকে ঘুরতে হবে। প্রথমে পড়বে পঞ্চায়েত অফিস, তারপর বাজার। বাজার ছাড়িয়ে রাজীবস্যারের বাড়ি। গুগল ম্যাপ তাই বলছে।

অম্লান বুঝিয়েছিল, 'যে লোকেশন পাঠিয়েছি, সেটা ধরে যাবি। তেমন হলে রাস্তায় কাউকে জিজ্ঞেস করে নিবি। তুই তো নতুন লোক নোস।'

চারপাশ তাকাল ঋক। দশ বছর হল বালি-দুর্গাপুর ছেড়েছে। আর আসা হয়নি। বাবা মারা গেলেন। ও আর দাদা মিলে তখনই ঠিক করেছিল বাড়ি বিক্রি করে দেবে। না দিয়ে উপায় ছিল না। দাদা দিল্লিতে থিতু। কালিকাপুরে ফ্ল্যাট হয়েছে ঋক-অন্বেষার। তাই বাবার মৃত্যুর পর চার কামরার একতলা বাড়ি পড়ে থাকত।

উড়ো ফোন আসত, 'বাড়ি বেচে দিন।ভালো দাম দেব।'

ঋকের ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু দাদা বলেছিল, 'এতদিন তবু বাবা বাড়ি আগলে থাকতেন। বলতেন, 'এখানে আমার বাবা-মা, তোদের মায়ের স্মৃতি রয়েছে।' এখন কে দেখবে? পাড়ার লোকেরাও সুবিধের নয়। আমার মতে, সেন্টিমেন্টকে আঁকড়ে না থেকে বিক্রি করাই ভাল। পরে দাম পাবি না। জবরদখল হতে পারে।' অন্বেষাও সায় দিয়েছিল দাদার প্রস্তাবে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। মাস তিনেক লেগেছিল বিক্রি করতে। টাকা দুই ভাইয়ের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেছিল। বাড়ি বিক্রির পর আর আসা হয়নি বালিতে। এল এত বছর বাদে।

নিশ্চিন্দা থানার রাস্তা ধরে ঢুকে দেখল, চারপাশ পালটে গেছে। যে সব ফাঁকা মাঠে আগে আড্ডা দিয়েছে, সেখানে বড় বড় বাড়ি। পুকুর, ঝিল কিছুই বাদ যায়নি। রাস্তাঘাট ভাঙাচোরা। প্রচুর উঁচু-নিচু বাম্পার। দু'পা অন্তর দোকান। গাছপালা কম। ফুরফুরে জায়গা কেমন ঘিঞ্জি হয়ে উঠেছে।

বেলানগর রেলগেট পেরিয়ে বুঝল, ওপাশেরও ভোল বদলেছে।

ঋকের মন খারাপ হয়ে গেল। একবার ভাবল, না এলেই হত। কী দরকার ছিল টাকার দায়িত্ব ঘাড়ে নেওয়ার? অনায়াসে অম্লানের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া যেত।

ওদের একমাত্র ছেলে বিলু দুর্দান্ত রেজ়াল্ট করেছে আইএসসি-তে। সেই উপলক্ষে যাদবপুরে

শ্বশুরবাড়িতে আজ রাতে বড় খাওয়া-দাওয়া। অন্বেষা সকাল সকাল ছেলেকে নিয়ে চলে গেছে সেখানে। কথা হয়েছে, বালি ঘুরে ঋকও পৌঁছবে। এই সেলিব্রেশনের পিছনে আরও কারণ আছে। বিলু বাইরের তিন-চারটে কলেজে সুযোগ পেয়েছে। কোনও একটায় পড়তে যাবে। ঋক এবং অন্বেষারও তাই ইচ্ছে। অতএব ছেলে আর বেশিদিন কাছে নেই।

একে বদলে যাওয়া পুরনো জায়গা, তার ওপর ছেলে চলে যাবে, দুইয়ে মিলিয়ে ঋকের মেজাজ খিঁচড়ে গেল। হঠাৎ ওর রাগ গিয়ে পড়ল দীপেশের ওপর। রাজীবস্যারের প্রতি অত দরদ থাকলে নিজে এলেই তো পারতি? গরমের দুপুরে আমাকে কেন ছোটানো!

ঘটনার সূত্রপাত সপ্তাহ তিনেক আগে। স্কুলের বন্ধুদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। এমন গ্রুপে সাধারণত হালকা জোকস পোস্ট করে অনেকে। কেউ রাজনীতি নিয়ে তর্ক করে। দু'-তিনজন বন্ধু মিলে ঘুরতে গেলে তার ছবি দেয়। ঋক এই গ্রুপের সঙ্গে জড়িয়ে। মাঝে বন্ধুরা পিকনিক করেছিল। তিনজন উদ্যোক্তাদের একজন ছিল ঋক।

সেই গ্রুপে দীপেশ লিখল, 'শুনলাম, রাজীবস্যার খুব অসুস্থ। সেরিব্রালে শরীরের একদিক পড়ে গেছে। পেনশনের টাকা ছাড়া পরিবারের আর কোনও রোজগার নেই। স্যারের মেয়ের বিয়ে নিয়েও নাকি গোলমাল হয়েছিল। চিকিৎসার খরচ সামলাতে স্যারকে ভাঙা টালির বাড়িতে সরে যেতে হয়েছে। আমরা ছাত্ররা কি কিছু করতে পারি না?'

দীপেশ আরও লিখল, স্কুলে থাকতে ও ইংরেজিতে কাঁচা ছিল। রাজীবস্যার আলাদা করে পড়া দেখিয়ে দিতেন। ধীরে ধীরে ইংরেজিতে ওর ভয় কেটে যায়। বিষয়কেভালোবাসতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত ইংরেজি অনার্স নিয়ে পাশ করে, স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিয়ে, ও এখন ইংরেজির শিক্ষক।

রাজীবস্যার যে এমন বহু ছাত্রকে পড়াতেন, ঋক জানে। নিজেও অনেকদিন গেছিল স্যারের কাছে পড়া দেখতে। তাই ও লিখল, 'নিশ্চয়ই করা উচিত।'

বন্ধুদের মধ্যে বালি-দুর্গাপুর কিংবা বেলানগরে অম্লান ছাড়া এখন আর কেউ থাকে না। অনেকে বাইরের রাজ্যে। কেউ কেউ কলকাতা, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ির মতো জায়গায় ছড়িয়ে। দীপেশই যেমন নিজেদের দেশের বাড়ি রামপুরহাটের কাছাকাছি স্কুলে চাকরি পেয়েছে।

গ্রুপের তরফে অম্লানকে দায়িত্ব দেওয়া হল খোঁজ নেওয়ার। দু' দিনের মাথায় অম্লান রিপোর্ট দিল, 'রাজীবস্যার সত্যিই অসুস্থ। দেখার কেউ নেই।'

এরপর হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। বন্ধুরা মিলে ঠিক করল, কিছু কিছু টাকা দেবে।

অম্লান আরও জানাল, 'স্যারের যা অবস্থা দেখলাম, তাতে দু'-পাঁচ হাজারে কিছু হবে না।'

দীপেশ উৎসাহ নিয়ে বলল, 'আমি দেব পঁচিশ হাজার। তোরা কে কত দিবি বল?'

সবাই গ্রুপে লিখতে শুরু করল টাকার অঙ্ক। দেখা গেল, সাড়ে তিন লাখ টাকার মতো হচ্ছে। প্রশ্ন উঠল, টাকা

কোন অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে!

বন্ধুরা চেপে ধরল ঋককেই। গোড়ার দিকে ও গাঁইগুঁই করেছিল, ‘টাকাটা আমার ইনকাম হিসেবে চলে আসবে।’

ওদের গ্রুপের চঞ্চল কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট। ঋকের কথার উত্তরে লিখল, ‘আমি সাল্টে দেব।’

রাজি হল ঋক। ঠিক হল, অম্লান আর ও গিয়ে রাজীবস্যারের বাড়িতে এক শনিবার টাকা দিয়ে আসবে। সেই মতো আজকের দিন বেছেছিল দু’জনে।

কিন্তু সকালবেলা অম্লানের ফোন। শ্বশুরমশাই আগের রাতে পড়ে গিয়ে কোমর ভেঙেছেন। ওঁকে দমদমে শ্বশুরবাড়িতে ছুটতে হচ্ছে। রাজীবস্যারের বাড়ি ওর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

‘পরের শনিবার চল!’ঋক বলেছিল।

‘কাজটা ঠিক হবে না। স্যারের পরিবারের যা অবস্থা, তাতে টাকা যত আগে দেওয়া যায়, ততভালো। তুই বরং একা যা। তা ছাড়া শ্বশুরমশাইয়ের এখন কী হবে, সেটাই মাথায় ঢুকছে না। দেখলি, পরের শনিবারও আমার হল না। তখন?’

বাধ্য হয়ে ঋক একা এসেছে।

বাঁ হাতে অভয়নগর দু’ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিস ছাড়িয়ে ও এগোল। প্রবল গরমে রাস্তাঘাট শুনশান। একটা বন্ধ দোকানের সামনে দুটো কুকুর শুয়ে ঝিমোচ্ছে। ঋক মন্থরগতিতে গাড়ি চালাচ্ছিল। গলি পেরিয়ে গেলে মুশকিল। আবার ঘুরে আসতে হবে।

হঠাৎ ওর স্মরণে এল অরুন্ধতীর কথা। রাজীবস্যারের মেয়ে। ওদের চেয়ে মাত্র এক ক্লাস নীচে পড়ত। ঋকেরা যখন নাইনে, অরুন্ধতী এইটে। ছোট কপাল। টানা টানা চোখ। পাতলা ঠোঁট। পিঠের ওপর মোটা বিনুনি ঝুলত। গায়ের রং ফর্সা। অরুন্ধতী যখন স্কুলে যেত, তখন ছেলেরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। রাজীবস্যারের ভয়ে কেউ এগোতে সাহস পেত না।

অরুন্ধতীও নিজের কদর জানত। তার ওপর মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে। ছেলেদের বিশেষ পাত্তা দিত না। অরুন্ধতীর টানে ঋক প্রায়ই হানা দিত স্যারের বাড়িতে। তখন স্যার থাকতেন বেলানগর রেল স্টেশনের কাছে। ভাড়া। ছাত্রদের জন্য তাঁর দরজা সব সময় খোলা। বাইরের ঘরে তিনি পড়াতেন। ঋকের পড়ায় মন বসত না। শুধু উশখুশ করত কখন অরুন্ধতীকে দেখা যাবে। দেখা যেতও। হয়তো স্যারকে চা দিতে এল। কিংবা বাইরের ঘর পেরিয়ে কোথাও বেরোল। ফিরল।

রাজীবস্যার তন্ময় হয়ে পড়াচ্ছেন। ঋকের চোখ শুধু অরুন্ধতীকে অনুসরণ করছে।

ওইটুকুতে মন ভরত না। অরুন্ধতীর স্কুলে যাওয়ার রাস্তায় দাঁড়াত। এমন ভাব করত যেন বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছে। মাসখানেক যেতেই মেয়েটা ধরে ফেলল। একদিন অরুন্ধতী সাইকেলে চালিয়ে সামনে দিয়ে গেল, ঋক যথারীতি ওর দিকে তাকিয়ে। কিছুটা গিয়ে অরুন্ধতী আচমকা ঘাড়

TAJ MAHAL
FLAVORS OF INDIA
LIVERMORE

ঘুরিয়ে দেখল ওর দিকে। চোখাচোখি হল। ঋক বুঝতে পারল, ধরা পড়ে গেছে।

ভারি অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল ও। ভয়ও ছিল, অরুন্ধতী যদি বাড়িতে বলে দেয়! তেমন কিছু অবশ্য হয়নি। এরপর মুখোমুখি হলে অরুন্ধতীর ঠোঁটে হালকা হাসির আভাস ফুটে উঠত। ঋকের মনের জোর ছিল না। অরুন্ধতী লাল পাড়ের সাদা শাড়ি আর লাল ব্লাউজ পরে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে— এই দৃশ্যটুকু ছিল ওর কাছে সব। এর বেশি এগোনোর কথা ভাবতে পারত না। অরুন্ধতীর সেই চেহারার সঙ্গে মিল ছিল ওদের বাড়ির সামনের কৃষ্ণচূড়া গাছটার। বসন্তকালে ওই গাছও অমন লাল হয়ে ফুটে থাকত রাস্তার ধারে।

একবারই অরুন্ধতীর সঙ্গে কথা হয়েছিল। দুর্গাপুজোর সময়ে। তখন পুজোর এমন জাঁকজমক ছিল না। তিন-চারটে প্যান্ডেল হত। সকাল থেকে গান বাজত। ছোটরা মণ্ডপে গিয়ে ক্যাপ পিস্তল ফাটাত। যারা ওদের মতো বড়, তারা দলবেঁধে আড্ডা দিত। ছেলেদের আলাদা গ্রুপ। মেয়েদের আলাদা।

সেই বছর দুর্গাপুজোয় দফায় দফায় বৃষ্টি হচ্ছিল। সন্ধেবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্যান্ডেলের দিকে যাচ্ছে, হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি। জায়গা না পেয়ে এক বন্ধ বাড়ির ছাউনিতে গিয়ে ও দাঁড়াল। হঠাৎ খেয়াল হল, পাশে আরও কেউ। আধো-অন্ধকারে পাশের জনের দিকে তাকিয়ে ওর বুক উত্তেজনায় ঝিলিক দিয়ে উঠল। অরুন্ধতী!

দু'জন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল। অল্পক্ষণ। তারপর চোখ নামিয়ে নিল ঋক। অন্য কোনও মেয়ে হলে ও সহজে কথা বলতে পারত। অরুন্ধতীর সঙ্গে তা সম্ভব নয়।

অরুন্ধতী অবশ্য কথা বলার চেষ্টা করেনি। বরং হাত বাড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করল, বৃষ্টির জোর কেমন। তার অবশ্য দরকার ছিল না। তুমুল বৃষ্টি পড়ছে। বাজও পড়ল হঠাৎ। সেই আচরণ দেখে ঋক ভাবল, ওর কাছ থেকে অরুন্ধতী চলে যেতে চাইছে। তাই ছটফট করছে।

জড়তা কাটিয়ে ঋক বলল, 'ছাতা নিয়ে বেরোওনি?'

অরুন্ধতী উত্তর দিল না। অন্ধকারে বাঁ হাত তুলে দেখাল। সেই হাতে ভিজে ছাতা ধরা।

আর এক ধাপ এগোল ঋক। বলল, 'বৃষ্টি চট করে থামবে না। তুমি ছাতা মাথায় বেরিয়ে পড়ো। বেশি ভিজবে না। নেতাজি মহল ক্লাব তো সামনেই।'

'তুমি?'এতক্ষণে মুখ খুলল অরুন্ধতী।

'আমি! আমি কী করে যাব?'

'ছাতা নাওনি?'

'পুজোর সময় কেউ ছাতা নিয়ে ঘোরে?'ঋক হাসার চেষ্টা করল।

'হিরোগিরি!'অরুন্ধতীও হাসল।

ঋক বুঝতে পারল না, কথাটাভালো না খারাপ?

শরৎকালের বৃষ্টি হুট করে যেমন আসে, তেমনই যায়। তাই মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বৃষ্টির বেগ কমে এল। আরও দু' মিনিট টিপটিপিয়ে পড়তে লাগল।

অরুন্ধতী ছাতা খুলল। বলল, 'চলো'।

ঋক হকচকিয়ে গেল। এক ছাতার নীচে ও আর অরুন্ধতী যাবে! বড়রা কেউ দেখতে পেলে?

অরুন্ধতী বলল, 'চিন্তা নেই। বৃষ্টির জেরে লোডশেডিং। গান বন্ধ হয়ে গেছে। খেয়াল করেছ?'

টনক নড়ল ঋকের। তাই তো! কখন লোডশেডিং হয়েছে উত্তেজনার জেরে লক্ষ করেনি।

সন্তর্পণে ও গিয়ে ঢুকল ছাতার নীচে। একে অপরের কাছাকাছি আসায় মিষ্টি গন্ধ নাকে এল। কোনও ক্রিম মেখেছে অরুন্ধতী। অন্ধকার রাস্তায় দু'জন পাশাপাশি হাঁটতে থাকল। কিছু দূর যাওয়ার পর অরুন্ধতী বলল, 'আমার স্কুলে যাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে থাকো কেন?'

ঋক চুপ। অরুন্ধতীও। আরও খানিক রাস্তা দু'জন হাঁটল। প্যান্ডেলের কাছাকাছি এসে অরুন্ধতী বলল, 'আমি জানি। কাউকে বলব না।'

বৃষ্টি ততক্ষণে থেমে গেছে। ছাতা বন্ধ করে অরুন্ধতী এগিয়ে গেল। ঋক দাঁড়িয়ে থাকল। কিছু বলতে পারল না।

এরপর আবার ঋক গিয়ে দাঁড়িয়েছে অরুন্ধতীর স্কুলে যাওয়ার রাস্তায়। আবার দেখা হয়েছে। অরুন্ধতী ফিক করে হেসেছে। তবু কেউ আর কোনওদিন কথা বলেনি।

একেই কি বলে বাল্যপ্রেম!

বাজার ছাড়ানোর পর বড় মাঠ পড়ল। মাঠের কথা অম্লান বলেছিল। কিছুটা গেলে বাঁ হাতে সরু গলি। মুখে কলাবাগান। গলির ভেতরে রাজীবস্যারের বাড়ি।

কলাবাগানও এসে গেল।

রাস্তার ধার ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাল ঋক। খাম নিয়ে নামল। এবারহেঁটে যেতে হবে।

কাঠফাটা রোদ। তবু গলিতে ঢুকে ঋকের মনে হল, এদিক বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা। কলাবাগানের পর বটগাছ। আরও কয়েকটা গাছ। সেই সব পেরিয়ে তিন-চারটে বাড়ি। বেশির ভাগ টালির চালের। ইটের গাঁথনি দেওয়া। গলির শেষ বাড়ি রাজীবস্যারের। নোনাধরা। টালির চাল। সামনে শাকসবজির বাগান। লাউ, উচ্ছের মতো কিছু লতানো গাছ ছাড়া আর কিছু নেই।

অবাক হল ঋক। রাজীবস্যার তো পেনশন পান। তা হলে এত খারাপ বাড়িতে থাকেন কেন?

নিজেকে অল্প গুছিয়ে নিয়ে ও দরজার সামনে গিয়ে কড়া নাড়ল।

ভেতর থেকে ক্ষীণ গলায় কেউ বলল, 'খুলছি!'

আরও এক মিনিট পরে খুলে গেল দরজা। ঋক দেখল, এক ভদ্রমহিলা। শীর্ণ চেহারা। সব চুল সাদা। হাত-পা কাঠি কাঠি। স্যারের স্ত্রীকে চিনতে সময় লাগল ওর। কী চেহারা হয়েছে! স্যার বামপন্থী মানুষ ছিলেন। পুজোপার্বণে থাকতেন না। কিন্তু স্ত্রী থাকতেন। দুর্গাপুজোর দশমীর দিন লাল পাড়ের গরদের শাড়ি পরে প্রতিমা বরণ করতেন। সিঁদুর খেলতেন। সেই চেহারা এখনও ঋকের চোখে ভাসে।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'বলুন?'

'আমি স্যারের ছাত্র। এক সময় প্রায়ই স্যারের কাছে আসতাম। স্যার অসুস্থ শুনে...'

‘ভেতরে এসো।’

জুতো খুলে ঢুকতে গিয়ে মাথায় চোট পেল ঋক। দরজা নিচু। খেয়াল করেনি।

ভদ্রমহিলা বললেন, ‘সাবধানে।’

কপালে হাত বোলাতে বোলাতে ও ঘরে ঢুকল। বাইরের ঝাঁঝালো আলো থেকে অন্ধকারে এসে প্রথমে কিছু দেখতে পেল না।

ভদ্রমহিলা বললেন, ‘ও এখন ঘুমোচ্ছে। শরীরভালো নেই। সপ্তাহে দু’ দিন কল্লোল এসে ফিজিওথেরাপি করে যায়। চেনো কল্লোলকে? ওর ছাত্র ছিল।’

মাথা নাড়ল ঋক। চেনে না। তাই বলল, ‘আমি অম্লানের ব্যাচ।’

‘অম্লান?’

‘যে কিছুদিন আগে এসে খোঁজ নিয়ে গেছিল।’

‘অম্লান বলে তো কেউ আসেনি।’

‘আপনি হয়তো তখন ছিলেন না...’

ভদ্রমহিলা হাসলেন। বললেন, ‘আমি ছাড়া এখানে ওকে দেখার কেউ নেই। আমিই আয়া। আমিই নার্স। আমিই স্ত্রী।’

‘আপনার মেয়ে?’ঋকের মুখ থেকে প্রশ্নটা ছিটকে বেরোল।

ভদ্রমহিলা সরাসরি জবাব দিলেন না। বললেন, ‘এত রোদে এলে। জল খাবে?’

‘না,’বলল ঋক। ধাক্কা লাগার জেরে হোক কিংবা অম্লানের আচরণে, ওর মাথা অল্প ঝিমঝিম করে উঠল। কেন আসেনি অম্লান?তার চেয়েও বড় কথা, না-এসে আসার ভান করল কেন? আজকেও কেন এড়িয়ে গেল? হঠাৎ পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হল ওর কাছে। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে এখানে থাকে কেবল অম্লান। বাকিরা টাকা দিয়ে সরে থাকতে পারবে। অম্লান একা ফেঁসে যেতে পারে। দরকারে-অদরকারে স্যারের পরিবার ডাকাডাকি করবে। সেই ঝক্কি এড়াতেই অম্লান পালিয়ে গেছে।

রাজীবস্যারের স্ত্রী প্লাস্টিকের টুল নিয়ে এলেন। ভদ্রমহিলাকে কোনওদিন কিছু সম্বোধন করেনি ঋক। এখনই বা কী বলে ডাকবে? শেষে ও ঠিক করল, ভাববাচ্যে কথা বলবে।

ঋক জিজ্ঞেস করল, ‘স্যার এখন কেমন আছেন?’

‘ডান পাশ পড়ে গেছে। ঠিকমতো চিকিৎসা করলে হয়তো কিছু হত। কিন্তু টাকা কোথায়?মামলা করেই তো মানুষটা ঝাঁঝরা হয়ে গেল।’

রাজীবস্যার যে মামলাবাজ এটা ওদের মনে হয়নি। ঋক তবু জানতে চাইল, ‘এখন কি দেখা করা যায়?’

‘কাল সারারাত ঘুমোতে পারেনি। লোডশেডিং ছিল। এখন ঘুমিয়েছে। ডাকাডাকি করলে শরীর খারাপ করতে পারে।’

‘আপনিও ঘুমোচ্ছিলেন?’

“আমার আর ঘুম!” ভদ্রমহিলা হাসলেন।

ঋক খামটা এগিয়ে দিল। বলল, ‘কয়েকজন মিলে

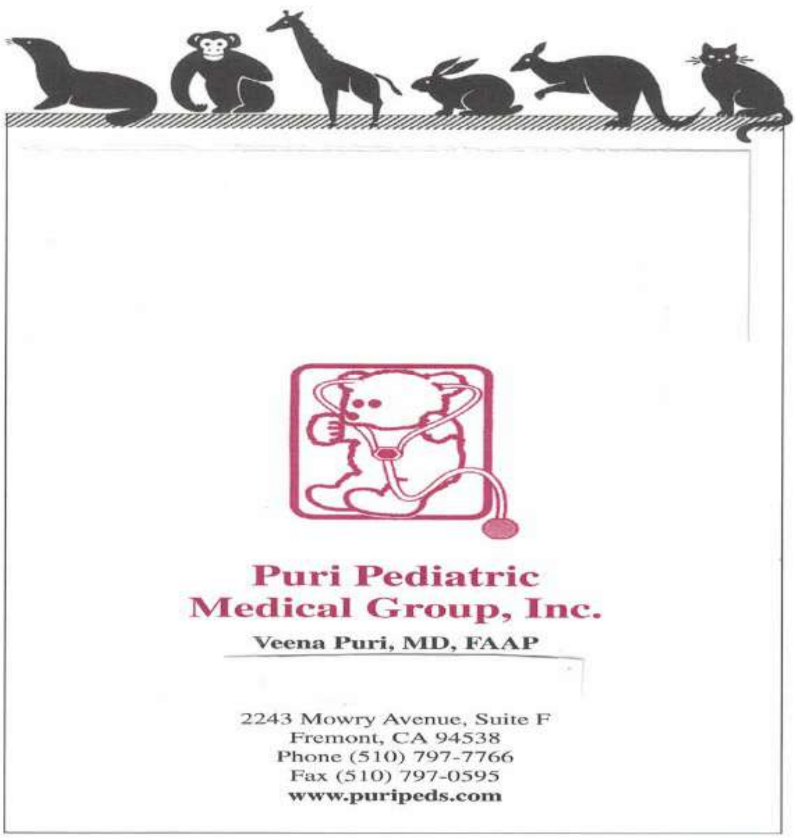

স্যারের চিকিৎসার জন্য সামান্য কিছু এনেছি। দয়া করে ফিরিয়ে দেবেন না।'

ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালেন। হাত বাড়িয়ে খাম নিলেন। পাশে কাঠের টেবিল থেকে চশমা পরে চেকের অঙ্ক দেখলেন। আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'এ তো অনেক টাকা! তোমরা কারা? কোনওদিন দেখিনি তো! হঠাৎ বাড়ি বয়ে এসে এত টাকা দিচ্ছ?'

ঋক বলল, 'দেখেছেন। তখন ছোট ছিলাম। চেহারা অন্য রকম ছিল। তাই চিনতে পারছেন না। আমরা স্যারের পুরনো ছাত্র। তারপর যা হয়। চাকরির টানে এখানে থাকা হয় না। কেউ থাকে দুর্গাপুরে। কেউ কলকাতায়। তাই বন্ধুরা মিলে এই টাকা সংগ্রহ করেছি।'

ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলেন না।

ঋক নিজের কার্ড এগিয়ে দিল। বলল, 'এখানে আমার নম্বর আছে। যে কোনও দরকারে যোগাযোগ করবেন। আমরা কেউ না-কেউ চলে আসব।'

ঋকের জন্য আনা টুলে ভদ্রমহিলা ধপ করে বসে পড়লেন। বিড় বিড় করে বললেন, 'তখন তো অনেকে আসত। উনি টাকাপয়সা না নিয়ে এমনিই পড়াতেন। রাগারাগি করলে বলতেন, 'আমি তো মাইনে পাচ্ছি। ছাত্রদের আলাদা পড়া দেখিয়ে টাকা নেব কেন?'

ঋক বলল, 'সোমবার চেকটা ব্যাংকে ফেলে দেবেন।'

'সেটাও মুশকিল। মানুষটাকে ফেলে যাব কী করে? ব্যাংক কি এখানে!'

'আপনার মেয়ে কি দূরে থাকে?'

ভদ্রমহিলা শূন্য চোখে বললেন, 'ও আর নেই।'

'নেই!'

'মারা গেছে।'

চমকে উঠল ঋক।

ভদ্রমহিলা ইশারায় দেওয়ালে টাঙানো মেয়ের ছবি দেখালেন। চোখ সয়ে এসেছে। ঋক দেখল, বছর পঁচিশের অরুন্ধতীকে। যার মুখের আদল সেই কৈশোরের অরুন্ধতীর মতোই।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'বিয়ে দিয়েছিলাম খড়দহে। বনেদি পরিবার। আমার মামাতো ভাই সম্বন্ধ এনেছিল। বিয়ের পর সব ঠিক ছিল। তারপর জানা গেল, ছেলের চরিত্রভালো নয়। প্রায়ই মারধর করত। রাতে মদ খেয়ে ফিরে ঝামেলা। তবু মেয়ে পড়েছিল ওখানে। আমাদের কিছু জানায়নি...'

'জানায়নি কেন?'

'তখন তোমার স্যারের একবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গিয়েছিল। ও ভয় পেয়েছিল, জানাজানি হলে যদি বাবার কিছু হয়! তাই চুপচাপ মেনে নিয়েছিল।'

'ছেলেপুলে?'

'হয়নি,'থেমে আবার বললেন, 'তোমার স্যার জানতে পারলেন বছর সাতেক বাদে। তখন সেই নিয়ে হুলস্থূল। ও গিয়ে ভয় দেখাল, জেলে পুরে দেবে। মেয়েও বোধহয় বাবার জোরে কিছু করেছিল। একদিন খবর পেলাম, মেয়ে রান্নার গ্যাস জ্বালাতে গিয়ে গায়ে আগুন ধরিয়ে ফেলেছে। ছুটলাম দু'জনে। হাসপাতালে গিয়ে জানতে পারলাম, মেয়ের সারা শরীর ঝলসে গেছে। কথা বলার অবস্থায় নেই। মেয়েটা আমার সেই ভাবে মারা গেল।'

'পুলিশে ইনফর্ম করেননি?'

'তোমার স্যার করেননি আবার! বার বার বলতেন, 'ওদের আমি ছাড়ব না। এটা আমার মিশন।' কিন্তু ওরা অনেক চালাক। ঘটনার দিন ছেলে এবং ছেলের মা-বাবা বাড়িতে ছিল না। তার ওপর যে অফিসার কেসটা দেখছিল, তাকে প্রচুর টাকা খাইয়ে রিপোর্ট নিজেদের দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছিল। এদিকে তোমার স্যার একা। তবু সর্বস্ব দিয়ে মামলা লড়ছিলেন। এক-এক রাতে ঘুম ভাঙলে দেখতাম, মানুষটা চুপ করে জানলা ধারে দাঁড়িয়ে। পাশে দাঁড়ালে বলতেন, 'ওরা পার পেয়ে যাচ্ছে বুঝলে। প্রচুর টাকা ঢালছে।' আমি বলতাম, 'ছেড়ে দাও।' রাজি হতেন না। বলতেন, 'মেয়ের মৃতদেহের সামনে শপথ নিয়েছি। শেষ দেখে ছাড়ব।' সেই করতে করতে সেরিব্রাল। মামলাও গেল। টাকাও গেল। এখন মানুষটা যেতে বসেছেন। দেখছ তো, দেনার দায়ে কোন বাড়িতে এসে উঠেছি। চিকিৎসা করাব কী, প্রতি মাসে পেনশনের অর্ধেক টাকা যায় ধার শোধ করতে।'

বেরিয়ে এল ঋক। স্যারের সঙ্গে দেখা না করেই। আসার আগে ফের তাকাল দেওয়ালের ছবির দিকে। স্মৃতিতে বেজে উঠল অরুন্ধতীর রিনরিনে স্বর, 'আমি জানি। কাউকে বলব না।'

বিকেল হয়ে এসেছে। রোদের তেজ আর নেই। হাঁটতে হাঁটতে বটগাছের কাছে এসে ঋক দাঁড়িয়ে পড়ল। আসার সময় খেয়াল করেনি, ওখানে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছও আছে। থোকা থোকা লাল ফুল। গাছটার দিকে তাকিয়ে ঋক দেখতে পেল, লাল সাইকেল। লাল পাড়ের সাদা শাড়ি। লাল ব্লাউজ। তারপরই বিকেলের আলোয় কৃষ্ণচূড়া গাছে আগুন লেগে গেল। লকলকে আগুনে সব পুড়ছে। পুড়েই যাচ্ছে।

দ্রুত গলি ছেড়ে বড় রাস্তায় উঠল ঋক। সব বাল্যপ্রেম কি শেষ পর্যন্ত পুড়ে ছারখার হয়ে যায়?

তুলিকলা: শ্রীতমা রক্ষিত

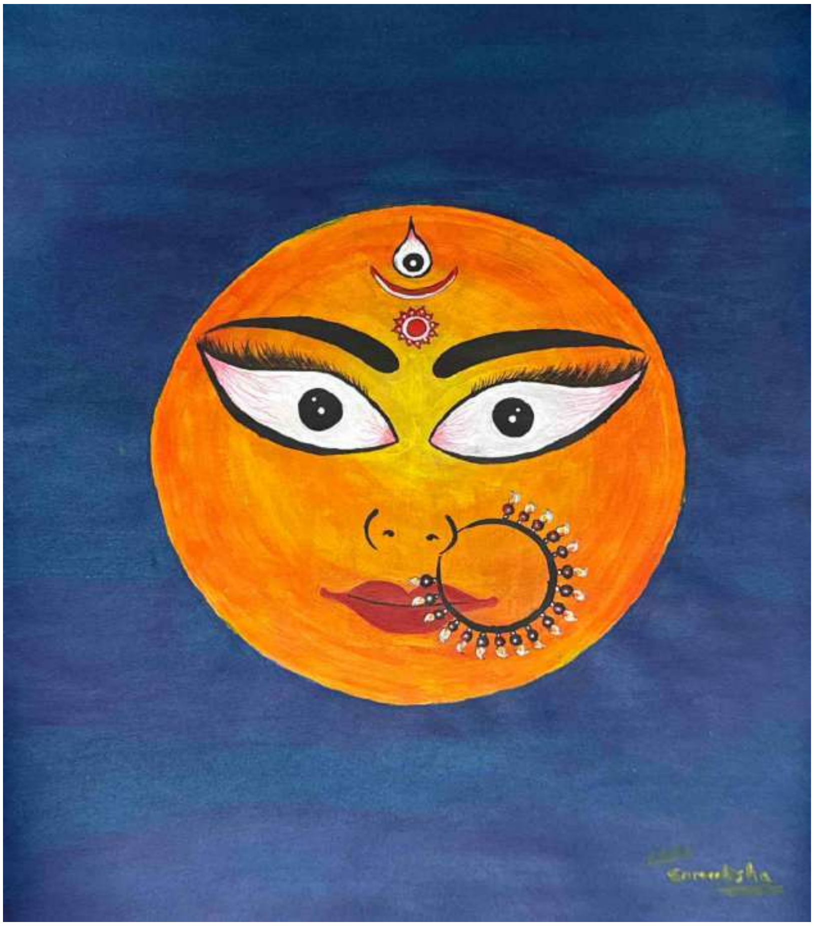

তুলিকলা: সমীক্ষা জোশী

তুলিকলা: অদ্রীতি মজুমদার,
১০ বছর

প্রেম অথবা খুনের গল্প

ইন্দ্রনীল সান্যাল

জন্ম ১৯ জুলাই ১৯৬৬। নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ থেকে স্নাতক। স্নাতকোত্তর পিজি হাসপাতাল থেকে। প্রথম প্রকাশিত গল্প উনিশ কুড়ি পত্রিকায় ২০০৪ সালে। সেই অর্থে ২০২৪-এ লেখালেখির কুড়ি বছর। প্রথম উপন্যাস প্রকাশ পায় সানন্দা পুজো সংখ্যায় ২০০৮ সালে। উপন্যাসের সংখ্যা একডজন ছাড়িয়েছে অনেক আগেই। লিখেছেন দুশোর ঢের বেশি গল্প। সদ্য প্রকাশ পেয়েছে বাছাই করা গল্পের সংকলন ‘পঞ্চাশটি গল্প’।

হাওড়া ময়দান জায়গাটা বরাবরই খুব গণ্ডগোলের। একের পর এক বেআইনি মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং-এ ঠাসা। আলমারির মতো দেখতে সেই সব বহুতলে আছে লেডিজ রুমালের মতো ছোট ছোট ফ্ল্যাট, যেখানে ভিন রাজ্যের মানুষদের বাস। এখানকার নেতা থেকে মস্তান, দোকানদার থেকে বেশ্যা,ব্যাবসায়ী থেকে চোর—সবার উৎস বিহার, উত্তরপ্রদেশ অথবা রাজস্থান।
এখানকারবাসিন্দা,মুন্না সিং-কে দিয়ে গল্প শুরু করা যাক। মা বাঙালি হলেও বাপ কোন রাজ্যের,মুন্না জানে না। বাপ কে,জানে না সেটাও। মুন্নার মায়ের ঘরে যেসব কাস্টমার বসত, তাদের মধ্যে কোনও একজন হবে।

বাপ নিয়ে কোনও আদিখ্যেতা নেই মুন্নার। মাকে নিয়েও ছিল না। সেই মহিলা যখন মারা যায়, তখন

মুন্নার বয়স পনেরো। স্কুলে যায় কিন্তু কোন ক্লাসে পড়ে জানে না। সারাদিন বন্ধুদের সঙ্গে এলাকায় বাওয়াল দিয়ে বেড়ায়। ডেনড্রাইট শোঁকা শুরু করার ঠিক আগেই সে নজরে পড়ল সুনীল শর্মার।

সুনীলউত্তরপ্রদেশের লোক। বছর পঞ্চাশের মানুষটি হাওড়া ময়দানের এক নম্বর প্রোমোটার। অতীতে পুকুর আর জলাজমি বুজিয়ে, পুরনো বাসিন্দাদের উৎখাত করে একের পর এক বহুতল তৈরি করেছিল। এখন সরকারি নিয়মকানুন মানার চেষ্টা করে। নিয়ম মানা বলতে,'জি প্লাস ফাইভ' ফ্ল্যাটের প্ল্যান স্যাংশান হলে সাততলার বেশি ওঠে না।

এই সুনীলের ডান হাতহল তার মামা, ষাট বছরেররামুশর্মা। শরৎ সদনের পিছনের মাঠে, ফুটবল খেলা নিয়ে গন্ডগোলের সময় রামুর চোয়ালে ঘুষি মেরেছিল মুন্না। রামু এত অবাক হয়েছিল যে বলার নয়। সে পাঁচটা খুনের আসামী, জেল খেটেছে বেশ কয়েকবার। এলাকার সবাই ভয় পায়। তার চোয়ালে,অন্তত কুড়িজন লোকের সামনে ঘুষি? তক্ষুনি মুন্নার লাশ ফেলে দিতে পারত রামু। কারণ শরৎ সদনের পিছনের মাঠটা পাতাখোরদের ঠেক। তারা সিসিটিভি ক্যামেরানিয়মিত ভেঙে দেয়। মুন্নাকে ওখানেই খুন করে দিলে পুলিশ জানতেও পারত না কার কাজ।

রামু সেটা করেনি। তার বদলে ষোল বছরের মুন্নাকে বাইকের পিছনে বসিয়ে বেলিলিয়াস রোডের শ্রী অ্যাপার্টমেন্টের টপ ফ্লোরে,সুনীলের ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়েছিল। সুনীলের কানে কানে বলেছিল,'একে কয়েকদিন রেখে দেখ, কেমন কাজ করে। ছোকরার হেব্বি জোশ। আমাকেও তো এবার দেশে ফিরতে হবে। নাতিনাতনির জন্যে মন কেমন করে।'

মামার কথা শুনে সুনীল রেখে দিল মুন্নাকে। সুনীল আর ওর বউ মোনার ফাইফরমাশ খাটা দিয়ে কেরিয়ার শুরু হলমুন্নার। ঠিক দু'বছর পরে প্রথম মার্ডারটা করল মুন্না।

সিন্ডিকেটের কাজে মার্ডার করা বড় কথা নয়। সবাই করে। বড় কথা অন্য। সুনীলের বিরোধী প্রোমোটার গোষ্ঠীর মাথা শুকদেব মণ্ডলের কাছের লোক লক্কাকে খুন করল মুন্না। রাতের অন্ধকারে শরৎ সদনের পিছনের মাঠে খুন করার পরেও মুন্নার নাম পুলিশের খাতায় উঠল না কারণ কেসটা ও নিখুঁত সাল্টেছিল।

কেসটার তদন্ত করছিলেন হাওড়া ময়দান থানার বড়বাবু লাল্টু সেন। উদগান্ডু টাইপের লোকটা কবিতা লেখে আর নন্দন চত্বরে ঘোরাঘুরি করে। সবাই বলে যে কবিতা লেখার পাশাপাশি লাল্টুর নিশানা খুব ভালো। ক্যালানোর ব্যাপারেও বেজায় সুনাম। যখন থানার সিলিং থেকে অপরাধীদের ল্যাংটো করে ঝুলিয়ে পাছায় লাঠির বাড়ি কষায় তখন তারা 'বাপ রে মা রে' বলে গলগলিয়ে সত্যি কথা বলে দেয়।

লাল্টুকে নিয়ে এত কিছু আমার জানার কথা নয়। আমি কখনও থানায় যাইনি। একবার টিভিতে দেখেছিমোমবাতি হাতে মিছিলে হাঁটছে। ভাটার মতো চোখ দেখলেই বোঝা যায়, মোমবাতিটা যার পিছনে গুঁজবে,তাকে খুঁজছে।

আমি কে এটা এখনও বলা হয়নি, তাই না?সরি সরি! আমার নাম লুসিয়াচৌধুরী। স্কুলের পড়াশুনো হাওড়ার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। হাওড়া গার্লস কলেজে পড়ার সময় কলেজ ছাড়তে বাধ্য হই। আমার আরও দুটো পরিচয় আছে। আমি মুন্নার লাভার। এবং এখন আমি সুনীলের ফ্ল্যাটে ঝি-গিরি করি।

২

আমার বাবা বিহারি আর মা বাঙালি। দু'জনের ধর্ম আলাদা বলে বিয়ে-শাদি নিয়ে দুই বাড়িতেই বিরাট লফড়া হয়েছিল। ওরা তাই লুকিয়ে বিয়ে করে কিষাণগঞ্জ থেকে পালিয়ে হাওড়ার বেলিলিয়াস রোডের এই বস্তিতে থাকতে শুরু করে। বাবা জুটমিলের লেবার ছিল,মা লোকের বাড়ি রান্না করত। আমার বয়স যখন তেরো বছর, বাবা রক্তবমি করতে করতে মরে যায়। রোজ রাতে চুল্লু খেলে যা হয় আর কি!

বাবা মারা যাওয়ার পরে মা একা হাতে সংসার চালাচ্ছিল। আমার বয়স যখন আঠেরো,মা ইঁদুর-মারা বিষ খেয়ে ফুটে গেল। সে কী কেচ্ছা রে ভাই! হাসপাতাল, মর্গ, থানা, শ্মশান— সব মিলিয়ে বিশাল ঝামেলা। কিছুটা টেনশন আর অনেকটা মন খারাপ নিয়ে ডাক্তার, ডোম, পুলিশ, বামুন— সবার কাছে খিস্তি খাচ্ছি, এমন সময় খেয়াল করলাম সানি দেওলের মতো দেখতে একটা ছেলে আমাকে খুব হেল্প করছে।

ব্যাটাছেলের চোখ দেখে মনের কথা পড়তে পারে সব মেয়ে। ছোকরার চোখে পিরিতি দেখে বুঝলাম, আমার ওপরে ফিদা! যাকে বলে হানড্রেড পার্সেন্ট লাভ! মায়ের মুখে আগুন দেওয়ার সময় মনে পড়ল সানি দেওলকে গত দু'তিন মাসে অনেকবার বস্তির সামনের রাস্তায় দু' পায়ের ফাঁকে বাইক গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।

কান্নাভেজা চোখে সানি দেওলের দিকে কয়েকবার তাকিয়ে সব কাজ করিয়ে নিলাম।এর মধ্যে ওর সঙ্গে আলাপ এবং মোবাইল নম্বর চালাচালি হয়ে গেল। মুন্নাআমার নামটা যখন নরম করে উচ্চারণ করল,মনে হল জিভে আইসক্রিম রেখেছে।শ্মশানের

কাজ চোকার পরে ও আমাকে বস্তি পর্যন্ত এগিয়েও দিল।

মায়ের শ্রাদ্ধের দিন এসেছিল। সব কাজমেটার পরে বললাম,‘কলেজে আর যাওয়া হবে না। কারণ মা কোনও টাকাকড়ি রেখে যায়নি। তুমি আমাকে একটা কাজ জুটিয়ে দাও। রোজগার করার জন্যে লাইনে নামতে চাই না।’

‘লাইনে নামার’ কথা শুনে খুনিয়া চোখে আমার দিকে তাকাল মুন্না। চোয়াল শক্ত করে বাইকে স্টার্ট দিয়ে উড়ে গেল।

পরের দিনই বাইকের পিলিয়নে বসিয়ে আমাকে ও নিয়ে গেল সুনীলের ফ্ল্যাটে। পাঁচ মিনিট সুনীলের বউ মোনার সঙ্গে কথা বলতেই আমার ঝিয়ের চাকরি পাকা হল। মুন্না বলল,‘এদের ‘দাদা’ আর ‘বউদি’ বলে ডাকবে।’

বউদি বলল,‘মাইনে ভালোইদেব। পাঁচ বাড়িতে কাজ করার দরকার হবে না। তবে একটাই শর্ত। এই বাড়ির কথা বাইরে কোথাও বলাযাবে না। বললে আমরা ঠিক জেনে যাব।’

আমি নীরবে ঘাড় নাড়লাম এবং পরের দিন থেকে কাজ শুরু করলাম।

সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত দাদার ফ্ল্যাটে থাকি, বাকি সময় বস্তির ঘরে। রোজই মুন্না ওর বাইকের পিছনেবসিয়ে আমাকে পৌঁছে দেয়। একটাও কথা বলে না।

দাদার ফ্ল্যাটে কাজ করার সময়েই জানতে পারলাম,মুন্নাএখন দাদার ডানহাত। জানতে পারলাম,মুন্না আমাকে ভালোবাসে কিন্তু লজ্জায় বলতে পারছে না। জানতে পারলাম যে বড়বাবু লাল্টু আমার দাদার সব কুকিত্তির খবর রাখে। নেহাতদাদার মাথায় এমএলএ-র হাত আছে, তাই কিছু করতে পারছে না।

আমি যে বরাবর মুন্নার প্রেমে লাট্টু ছিলাম, এই কথাটা বলা হয়নি, না?এখন তা হলে বলি। মাকে দাহ করার সময় ওকে প্রথম খেয়াল করি। তখনই সানি দেওলের মতো বডি আর মায়ামাখা চোখ দেখে পাগল হয়েছিলাম। নিজে কিছু না বলে অপেক্ষা করছিলাম ও কী বলে সেটা জানার জন্যে।

ঝি-গিরি শুরু করার মাস দুয়েক পরে একদিন ওকে বাড়িতে বসিয়ে বললাম,‘আমার সঙ্গে কথা বলো না কেন? আমি কি রাক্ষুসি?’

মুন্নাঘাবড়ে গিয়ে আমতা আমতা করে বলল,‘আমাকে বিয়ে করবে?’

Best compliments from

Sagar Thakkar
Financial Services Professional & Agent
CA License #0L90691

New York Life Insurance Company
Email - sthakkar01@ft.newyorklife.com
Phone - (614) 815-8711 | Text Only - (619) 373-9377
Website - www.newyorklife.com/agent/sthakkar01

'সোজা বিয়ে?' হাসিতে ফেটে পড়লাম,'আগে জিজ্ঞাসা করো,প্রেম করব কি না! জিজ্ঞাসা করো,'ডু ইয়ু লাভ মি?'

'ধ্যাত! ও সব আমি পারব না।' লজ্জায় মুন্নার কান লাল।

বাধ্য হয়ে ওর ঠোঁটে ঠোঁট রেখে বললাম,'তুমি কি আমায় ভালবাসো?'

তারপরে যা হল,কহতব্য নয়। না বললেও আপনারা বুঝে গেছেন। তবে ওই সবের পরে আমাদের সম্পর্কটা সহজ হয়ে গেল। দাদা-বউদির পরামর্শ মেনে আমরা রেজিস্ট্রি ম্যারেজটাও সেরে ফেললাম টুক করে। সামাজিক বিয়ে পরে হবে। টাকাপয়সা জমুক।

বিয়ের দিনকয়েকপরেমুন্নার সঙ্গে ফোরশোর রোডের শপিং মলে ঘুরতে গিয়েছিলাম। সিনেমা দেখে আর পিৎজা খেয়ে দুজনে গেলাম 'দেবাশিস ট্যাটু পার্লার'-এ। ট্যাটু আর্টিস্টকে বললাম,'আমাদের গায়ে একই রকমের ট্যাটু এঁকে দাও।'

আর্টিস্ট ছোকরার জিম করা চেহারা। সারা শরীরের মাসল কিলবিল করছে।সেগুলো সবাইকে দেখাবে বলে বগলকাটা গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরে আছে। সে পা বাড়িয়ে বলল,'আমার গোড়ালিতে এই যে ড্রাগনটা আঁকা আছে,এই রকম চলবে?'

ছোকরার পা খুব মন দিয়ে দেখলাম, তবে পছন্দ হল না। বললাম,'আপনার ঘাড়ের পাশে যে প্রজাপতিটা আঁকা আছে, ওই রকম চাই। আমার বরের বাইসেপে,আর আমার পিঠে।'

আমি ছোকরাকে পিঠ দেখাব বুঝে মুন্না গুম মেরে গেল। দুজনের ট্যাটু-পর্ব চুকে যাওয়ার পরে আমি আর্টিস্টের ভিজিটিং কার্ড নিলাম। বেসমেন্টের পার্কিং-এ এসে বাইকে বসল মুন্না। পিলিয়নে বসে মুন্নাকে জড়িয়ে ধরে বললাম,'মুখ গোমড়া কেন?'

গাঁগাঁ করে বাইক চালাচ্ছে মুন্না। কিছুক্ষণ পরে বলল,"আর কখনও এসব করবে না।"

'ঠিক আছে!'আমি মুচকি হাসলাম। মুন্নার বাইক তখন হাওড়া ময়দান থানা পেরোচ্ছে।

৩

হাওড়া ময়দান থানার বড়বাবু লাল্টু সেন এই গল্পের একমাত্র নিখাদ বাঙালি চরিত্র। এবং যথারীতি তিনি কবিতা লেখেন। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'গাভির মতো চরে' বেরিয়েছিল 'হাঁড়িচাঁচা প্রকাশনী' থেকে। প্রকাশকের মূল ব্যবসা গোরু পাচার।দ্বিতীয় কবিতার বই 'ঊষর মরু' বেরিয়েছিল 'উরিবাবা পাবলিশার্স' থেকে। সেই প্রকাশকের আসল ব্যবসা বালি পাচার। দুই প্রকাশককে জেল খাটানোর ভয় দেখিয়ে বই ছাপিয়েছিলেন লাল্টু। তিন নম্বর কবিতার বই,'কয়লা ধোয়া জল'বার করবে 'কার্বন প্রকাশন।'প্রকাশক কী করেন বলার জন্যে কোনও পুরস্কার নেই।

হাওড়া ময়দান থানার বড়বাবু হওয়া খুব ঝক্কির। প্রতিটি ক্রিমিনালের রাজনৈতিক যোগাযোগ আছে। কাউকে অ্যারেস্ট করলেই এমএলএ বা এমপি-র ফোন আসে। 'বহোত ইমানদার আদমি হ্যায়। কেসটা সাল্টে দিন স্যর।'অথবা,'পার্টিকা লিডার হ্যায় স্যর।

SENCO
GOLD & DIAMONDS

একটু দুষ্টুমি করে ফেলেছে। দেখে লিবেন।'

এর মধ্যে ব্যালান্স করে চলতে হয় লাল্টুকে। কবিতা লেখার সময় কই?

রামকেষ্টপুর ঘাটে ভোর চারটের সময় দুটো গ্যাং-এর মধ্যে ফায়ারিং হচ্ছিল। তার মধ্যে পড়ে রাতে-ঘুম-না-হওয়া এক বুড়ির প্রাণ যায়। নিরীহ মানুষ মারা গেছে কেন, এই ইস্যুতে মান্থলি ক্রাইম মিটিং-এ বসের কাছে বেজায় খিস্তি খেলেন লাল্টু। বস জানিয়ে দিলেন,'পরের মান্থলি মিটিং-এর আগে আমি এই ঘটনার শেষ দেখতে চাই। যদি না হয়, কোচবিহারেবদলির জন্যে তৈরি হও।'

সেই রাতেই বিশ্বস্ত খোচড়বিক্কিকে বাংলার ঠেকে ডেকে পাঠালেন লাল্টু। এক বোতল 'টারজান'অফার করে বললেন,'বল।'

বিক্কির আদি বাড়ি বেগুসরাই। এখন থাকে বেলিলিয়াস রোডে, আমার বস্তিতে। দিনের বেলা ট্রেনে চপমুড়ি বেচে, রাতের বেলা হাওড়া ময়দান চত্বরে হেরোইন। দিনে হকার,রাতে ড্রাগ পেড্‌লার। এক চুমুকে 'টারজান'-এর বোতল শেষ করে সে বলল,'সুনীল আর শুকদেবের দলের মধ্যে বিশাল ক্যালাকেলি হয়েছে এলাকা দখল নিয়ে।ওই বুড়ি গঙ্গায় যাচ্ছিল চান করতে। ফায়ারিং-এর মধ্যে ঘুসে গিয়েছিল। ওমনি দুম ফটাস!'

'কী নিয়ে ক্যালাকেলি?'

নিচু গলায় বিক্কি বলল,'সুনীলের ডানহাত মুন্নাএকটা অন্যায় কাজ করেছে। ও শুকদেবকে একটা বড় ডিল পাইয়ে কুড়ি লাখ টাকা কাটমানি খেয়েছে। সুনীল এখনও সেটা জানে না। কালকে কেউ একজন সুনীলকে রামকেষ্টপুর ঘাটে ভোররাতে ডেকেছিল কথাটা বলার জন্যে। তারপরে কী হয়, কেউই ভালো জানে না। ওর মধ্যেই বুড়ি মরে।'

'মুন্না কাজটা কেন করল?'

আমার সঙ্গে মুন্নার সম্পর্কের কথা বিক্কি জানত। সে বলতেই পারত,'আমার বস্তির একটা মেয়েকে মুন্নাবিয়ে করেছে। এখন এই লাইন ছেড়ে দিতে চাইছে।'তার বদলে বলল,'জানি না স্যর।'

লাল্টু ভুরু কুঁচকে বললেন,'মুন্নার গদ্দারির খবরটা সুনীল জানে?'

'এখনও না।'

'তুই এটা ওর কানে তুলতে পারবি?'

বিক্কি ভাবতে ভাবতে আর এক বোতল 'টারজান'শেষ করে বলল,'একটা শর্ত আছে। আপনি যতদিন এখানকার বড়বাবু থাকবেন,আমার রাতের কারবারে নজর দেবেন না।'

'দেবো না।'

'দিন দুয়েক সময় দিন। আমাকেও প্রাণে বাঁচতে হবে তো!'কানে মোবাইল গুঁজে বাংলার ঠেক থেকে বেরিয়ে গেল বিক্কি।

৪

সকালবেলা আমি ঘর ঝাঁট দিচ্ছিলাম এমন সময় বউদি দৌড়ে এসে বলল,'ওরে লুসিয়া!মুন্নাকে পাওয়া যাচ্ছে না!'

'মানে?' আমি অবাক!

দাদা সুনীল স্নান সেরে হনুমান চল্লিশা আওড়াচ্ছিলেন। সেটা থামিয়ে বউদিকে বললেন,'তোমাকে কে বলল?'

'বড়বাবু ফোন করেছিল। লাল্টু এখন আমাদের বাড়ি আসছে!' পাগলের মতো চেঁচাচ্ছে বউদি। দাদা চিৎকার করে মোবাইলে কাকে কী সব বলছে, ফ্ল্যাটের মধ্যে দৌড়োদৌড়ি করছে। এসব দেখতে দেখতে বললাম,'আমার মাথা ঘুরছে...' তারপর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান ফিরতে দেখলাম, দাদার বসার ঘরে সোফায় শুয়ে আছি। মাথা আর মুখ জলে ভেজা। সামনের সোফায় পাশাপশি বসে রয়েছে বউদি, দাদা আর লাল্টু।

চোখ খুলতেই লাল্টু আমার দিকে তাকিয়েবললেন,'মুন্না খুন হয়েছে।'

চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

লাল্টু বললেন,'শরৎ সদনের পিছনের মাঠে লাশ পড়ে আছে। মুন্নাকে বেধড়ক পিটিয়ে মুখ, বুক, হাত থেঁতলে দিয়েছে। লুসিয়া,তোমাকে এখন হাওড়া মর্গে যেতে হবে বডি আইডেন্টিফাই করার জন্যে।'

আমি আবার অজ্ঞান হয়ে গেলাম। আমার চোখেমুখে জলের ছিটে দিতে দিতে লাল্টু বললেন,'সুনীল, এটা তুমি না করলেই পারতে। হাজার হোক,তোমার নিজের লোক। একটা ভুলের জন্যে এত বড় শাস্তি?'

দাদা বলল,'আপনি এনকাউন্টার করে মুন্নাকে মেরেছেন। এখন আমার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন কেন?'

বউদি বলল,'কুড়ি লাখ টাকা কোথায় গেল খোঁজ নাও। ওই টাকার জন্যে যে কেউ মার্ডার করে দেবে।'

এসব কথার মধ্যে চোখ খুললাম। সঙ্গে সঙ্গে সবাই চুপ করে গেল। লাল্টু বললেন,'মা লুসিয়া,কাজটা করে দাও।'

আমি কান্না চেপে বললাম,'আমি না গেলেই নয়?'

'মুন্নার তিন কূলে কেউ নেই। বউছাড়া কে বডি আইডেন্টফাই করবে? বাকি কাজগুলোও তো তোমাকেই

করতে হবে।'

দাদার কানে কানে বউদি কিছু বলল।দাদাও সেই কথাটা গুজগুজ করে বলল লাল্টুর কানে। আমার বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। আমিই বউদিকে বলেছিলাম মুন্নার গোপন জায়গায় জন্মদাগের কথা।

বউদি আর আমি পুলিশের গাড়িতে চললাম হাওড়া মর্গে। দাদা তার লোকজন নিয়ে চলে এল নিজের গাড়িতে। টেবিলে শুইয়ে রাখা সানি দেওলের মতো চেহারার মুন্নাকে চিনতে একটুও অসুবিধে হল না। মুখ, বুক হাত থেঁতলে দিয়েছে তো কী হয়েছে? বাঁ থাইতে ভারতের ম্যাপের মতো দেখতে জন্মদাগটা যে আমার খুব চেনা। এই দাগের কথাই বউদিকে একদিন বলেছিলাম।

বউদি হাউহাউ করে কাঁদছে। দাদা আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল,'চিন্তা করিস না। আমি এর বিচার করব।' তারপর গনগনে চোখে লাল্টুর দিকে তাকাল। লাল্টুও একই ভাবে তাকিয়ে রয়েছেন দাদার দিকে।

আর আমি তাকিয়ে রয়েছি পেশীবহুল লাশের দিকে! ইস! কী মার মেরেছে বেচারাকে!

৫

মুন্নার চলে যাওয়ার পরে এক মাস কেটে গেছে। এখনও স্বাভাবিক হতে পারিনি। এত বড় ধাক্কা সামলানো সোজা কথা নয়। দাদা আর বউদির সামনে প্রায়ই ভেঙে পড়ি প্রবল দুঃখে আর কষ্টে। দাদা বলে,'বাচ্চা একটা মেয়ের জীবনে কতকিছু ঘটে গেল! ভাবাই যায় না।'

দাদা ঠিকই বলে। দাদার কথার সূত্র ধরেই বলা যাক কী কী ঘটে গেছে আমার জীবনে। মুন্না যে কুড়ি লাখ টাকা কামানোর ধান্দা করছে, এটা জানা মাত্র ওকে বলেছিলাম দাদার সঙ্গে গদ্দারি না করতে। মুন্না শোনেনি। বাধ্য হয়ে আমাকে কাজে নামতে হল। কী হতে পারে সেটা আন্দাজ করেই প্ল্যান ছকেছিলাম।

বিয়ের পর থেকেই বউদি নিয়মিত জিজ্ঞাসা করত মুন্নার সঙ্গে রাতে কী কী হল। আগে কখনও বলিনি। এবার অল্প তেল-মশলা মিশিয়ে রগরগে গল্প বলা শুরু করলাম। গল্পে গল্পে এটাও জানিয়েছিলাম যে মুন্নার বাঁ থাইতে একটা জন্মদাগ আছে। সেটা অবিকল ভারতের মানচিত্রের মতো দেখতে।

এই ঘটনার পাশাপাশি মুন্নাকে বলেছিলাম দেবুর সঙ্গে দোস্তি করতে।

বিক্কির কথা আগেই বলেছি। লাল্টুর সঙ্গে বসে দু' বোতল 'টারজান'খেয়ে বেরিয়েই বিক্কি আমাকে ফোন করে এবং বলে যে দু'দিন পরেদাদাকে কথাটা বলবে। যে সন্ধেবেলা বিক্কি দাদাকে ফোন করে বলল যে কুড়ি লাখ টাকার বিনিময়ে মুন্নাশুকদেবের হয়ে কাজ করেছে,সেই সন্ধেতেই মুন্নাকে বললাম কাজ সারতে। পরের দিন সকালে কী হল আপনারা জানেন। দাদার বাড়িতে চলে এলেন লাল্টু। আমরা গেলাম মর্গে, মুন্নার 'বডি' আইডেন্টিফাই করতে।

মুন্নাকিন্তু 'বডি' হয়ে যায়নি। সে পরের দিন বাবুঘাট থেকে ভোরবেলা বাস ধরে পটনা চলে গেছে। সেখান থেকে দিল্লি। ওখানে চেনা লোকজন আছে। মুন্নার এখন নতুন ভোটার আর আধার কার্ড হয়েছে। কুড়ি লাখ টাকার মধ্যে পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে ও গিয়েছে। বাকি পনেরো লাখ আমার কাছে আছে। মাস ছয়েক দাদার বাড়ি ঝিগিরি করার পরে আমি কাজ ছাড়তে চাইব। বলব,মুম্বই যাচ্ছি বিউটি পার্লারের কাজ করতে। দাদা-বউদি আপত্তি করবে না। উল্টে কয়েক হাজার টাকাও দিতে পারে।

তারপর আর কী? আমিও দিল্লি যাব। নতুন পরিচয় জোগাড় হয়েই যাবে। নতুন করে বাঁচা শুরু করব। বাচ্চাকাচ্চা হবে। সুখের সংসার হবে।

আপনারা ভাবছেন,ওই ডেডবডিটা কার ছিল? তাই না?বলি তা হলে। সেই সন্ধেতে দেবুকে আকণ্ঠ মাল খাইয়েছিল মুন্না। মাতালটাকে শরৎ সদনের পিছনের মাঠে নিয়ে গিয়ে গলা টিপে খুন করে। তারপর লোহার ডান্ডা দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে ওর মুখ,চোখ, বুক আর দুই হাত কিমা বানিয়ে দেয়।

'দেবাশিস ট্যাটু কর্নার'এর ট্যাটু আর্টিস্ট দেবুর সঙ্গে মুন্নার চেহারায় খুব মিল। দু'জনেই সানি দেওলের মতো মাসলওয়ালা। দু'জনের উচ্চতা এবং গায়ের রং-ও প্রায় এক। দেবু যখন ট্যাটু দেখানোর জন্যে নিজের পায়ের দিকে ইঙ্গিত করেছিল, তখনই খেয়াল করেছিলাম বাঁ থাইয়ের জন্মদাগটা। এবং ওই ম্যাপের জন্যে দেবাশিস ওরফে দেবুর কাছ থেকে ভিজিটিং কার্ডটা নিয়েছিলাম। ওখানে মোবাইল নম্বর দেওয়া ছিল। আমার প্ল্যান অনুযায়ী ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে মুন্না। বন্ধুত্ব পাতায়। মদ খাওয়ার পার্টনার হয়ে যায়।

আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন। বাকি জীবন যেন সুখে-শান্তিতে স্বামীর ঘর করতে পারি। সত্যি কথা কী জানেন?সব প্রেমের গল্পে নরম টেডি বিয়ার,সুগন্ধী গোলাপ ফুল আর সর্ষেখেত দিয়ে নায়িকা আর নায়কের অনন্ত দৌড় থাকে না। কখনও কখনও উলকির কালি,শুকিয়ে যাওয়া রক্ত,পিঠে ছুরি মারা গদ্দারি আর বেমক্কা খুন দিয়েও প্রেমের গল্প হয়।

তাই না?

তেত্রিশতলা

পেশায় চিকিৎসক। ইএসআই হাসপাতালে কর্মরত। মূলত প্রবন্ধ, গল্প,উপন্যাস লিখে থাকেন। প্রিয় বিষয় সমাজ, সম্পর্ক এবং রাজনীতি। এ পর্যন্ত নয়টি উপন্যাস লিখেছেন। আছে একটি গল্প সংকলন। ‘কুন্তল ফিরে আসে’ উপন্যাসের জন্য ২০১৯ সালে পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি যুবা পুরস্কার।

মৌমিতা

তুলিকলা: শ্রীতমা রক্ষিত

বিজনেস ক্লাসের তিন নম্বর সিটে বসেছিল পাওলো। এই প্লেনগুলো খুব আরামদায়ক। যদিও তারা লম্বায় চওড়ায় তত কিছু বিশাল নয়।পাওলো সব সময়ই এরকম প্লেন পছন্দ করে।ও দেখেছে ওর বন্ধুদের মধ্যে অনেকের বিরাট বিরাট পছন্দ। কিন্তু পাওলোর পছন্দ কখনওই সেরকম ছিল না। সে বাড়ি হোক, কিংবা গাড়ি। ওই সাতাশ তলার ওপরে থাকা কিংবা টুয়েলভ সিটার গাড়িতে চড়া ওর পোষায় না। ওর গাড়ি হবে ম্যাক্সিমাম ফোর সিটার। আর তাতেও থাকবে দুজন। হাওয়ার বেগে তা উড়ে যাবে ফ্লোরেন্স থেকে নেপলস কিংবা অন্য কোনও জায়গা থেকে আরও অন্য কোনও জায়গা। ওর বাড়ি হবে একটা হ্রদের ধারে, তাতে ঘর থাকবে তিনটে কিংবা চারটে। মানুষ থাকবে কম। বিরাট মাপের চেহারা যাদের আকৃষ্ট করে, পাওলো তাদের দলেও পড়ে না। সব সময়ই যে চেহারা টেনেছে ওকে, তারা ছিপছিপে গড়ন, তত কিছু বিরাট উচ্চতা নয়, কিন্তু তাদের হাসির মধ্যে একটা ঘূর্ণি থাকত যে ঘূর্ণি দুলিয়ে দিতে পারত মানুষতো ছার, গোটা পৃথিবীকে। সিনড্রেলা সেরকমই একটি মেয়ে ছিল, কিন্তু সিনড্রেলার কথা মনের মধ্যে গেঁড়ে বসার আগেই প্লেনের চাকা মাটি ছুঁল।

তাৎক্ষণিক ধাক্কা সামলে নিয়ে পাওলো সামনে তাকাতেই দেখল একটি ছেলে এবং মেয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। উড়ানের সময় এই মেয়েটিকে ও এরোপ্লেনের ভেতরেই দেখেছিল। যে রকম চেহারা ওর পছন্দ তার ধার-কাছ দিয়ে এ যেতে পারে। একেবারে খাপেখাপ না হলেও। কিন্তু ছেলেটাকে এই প্রথম দেখল। অবশ্য এই দেশে মুখ দেখে চেনা একটু কঠিন, কারও সঙ্গে প্রথম মোলাকাত নাকি দশম। তবে এর আগেও দু-তিনবার এই শহরে এলেও কোনও দিন কখনও প্লেন থামার সঙ্গে সঙ্গে কেউ ওর সামনে এসে দাঁড়ায়নি। হয়তো এবার অতবড় চুক্তিটা সই হবে বলেই একটু স্পেশাল খাতির পাওয়া যাচ্ছে। চুক্তিতো চুক্তি নয়। একেবারে মেগা চুক্তি, ভাবতে ভাবতেই পাওলোর ঠোঁটের কোণে হালকা একটা হাসি খেলে গেল।

ততক্ষণে প্লেনের দরজা খুলে গেছে। আর অন্য কেউ নামার প্রস্তুতি নেওয়ার আগেই ছেলেটি এবং মেয়েটি পাওলোকে মাঝখানে নিয়ে প্লেন থেকে নামতে আরম্ভ

করল। এবার আর লাগেজ কালেক্ট করার জন্য ওকে কনভেয়ার বেল্টের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে না, ও বুঝেই গেল। এয়ারপোর্ট থেকে বেরোতেই একটা লিমোজিন এসে দাঁড়াল ওর সামনে। আর লিমোজিনের পেছনের ডিকিটা খুলে যেতেই ও দেখতে পেল ওর লাগেজ সুন্দরভাবে সেখানে সেট করা আছে। বেশি মালপত্র নিয়ে ভ্রমণ করা পাওলোর একেবারেই না-পসন্দ। কিন্তু একটা বা দুটো লাগেজতো নিতেই হয়। যাই হোক, সেই লাগেজটা চেক করে নিয়ে ও ঢুকে গেল গাড়ির ভেতর। ওর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিও ঢুকল গাড়িতে। বসল ঠিক ওর পাশে। সামনের সিটে গিয়ে বসল ছেলেটি। পাওলো দেখল সে আয়না দিয়ে পাওলোকে দেখছে,সিটবেল্ট লাগাতে লাগাতে। মুহূর্তের জন্য অন্যরকম একটা কোনও সন্দেহ পাওলোর মাথায় ঘুরে গেল। কিন্তু সেটাকে বেশিক্ষণ দানা বাঁধতে দিলনা ও। বরং ভাবতে লাগল এই শহরে আগে যখন এসেছে তখন তার বাইরের রাস্তায় বেশ অনেকটা ভিড় ছিল। এখন তুলনায় বেশ ফাঁকাফাঁকা লাগছে। পাওলো নিজের ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে জানতে চাইল ওরা সরাসরি হোটেলে যাচ্ছে কিনা। কিন্তু কোনও উত্তর পেল না সামনে থেকে। সামান্য ঘুম আসছিল,পাওলো তাও ভেতরে ভেতরে চরম উৎসাহ বোধ করছিল বিজনেস ডিলটার কথা ভেবে। ওই একটা ডিল হয়তো ওদের কোম্পানির টালমাটাল অবস্থাকে অনেকটা ঘুরিয়ে দিতে পারবে। সংশয়ের অবকাশ রাখছে কেন? নিশ্চিত ঘুরিয়ে দেবে। যে ডিলের জন্য পৃথিবীর অজস্র কোম্পানি পাগল সেই ডিলটা প্রায় সেধে পাওলোর কোম্পানির সঙ্গে করছে এই সংস্থা। সারা পৃথিবীতে এখন নতুন করে অভ্রর চাহিদা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে পেট্রল ডিজেলের বদলে ইলেকট্রিক গাড়ি তৈরি হওয়ার সময় থেকে অভ্রর প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি করে অনুভব করছে সবাই। অভ্র যে কোনও ইলেক্ট্রিক ইনসুলেশনের কাজে একেবারে লা জবাব। আর সেই অভ্রর সাপ্লায়ারের কাজটাই পাওলোর কোম্পানি পেতে চলেছে। একবার ডিলটা হয়ে গেলে পরে ওর বিপুল ইনক্রিমেন্ট এবং তার সঙ্গে আরও বড় কোনও প্রোমোশন একেবারে বাঁধা। কিন্তু যে পজিশনে ও ইতিমধ্যেই চাকরি করে, সেখান থেকে আর কত বড় প্রোমোশনই বা ওর হতে পারে!হ্যাঁ এরপরের পোস্টটাই ভাইস প্রেসিডেন্ট। আর তারপর? তারপর পাওলো আর জানে না। বরং আজকে এই ডিলটা সঠিকভাবে সই করিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই ওর প্রায়োরিটি হওয়া দরকার। এই সব ভেবে ভেতরে ভেতরে পাওলো যে উত্তেজিত হচ্ছিল না তা নয়, কিন্তু একই সঙ্গে ওর মনে হচ্ছিল দেশে এবং দেশের বাইরে এশিয়া-আফ্রিকাতে ওর কোম্পানির প্রোডাকশন ইউনিটগুলোর কথা,সেখানে অহরাত্রি কাজ করা মানুষগুলোর কথা। এত বিপুল পরিশ্রমের পরও ক'টাকা আর মাইনে পায় তারা। কিন্তু তবুও তাদের মুখের সেই অফুরন্ত হাসি যেন সেই ভিটামিন যাকে কখনই কোনও ক্যাপসুলের ভেতর ধরা যায় না। পাওলোর মনে হচ্ছিল কেবল ও একা নয় বা ওর কোম্পানির বিগ বসরা নয়, ওদের ফ্যাক্টরির প্রত্যেকটা কর্মী, এমনকি

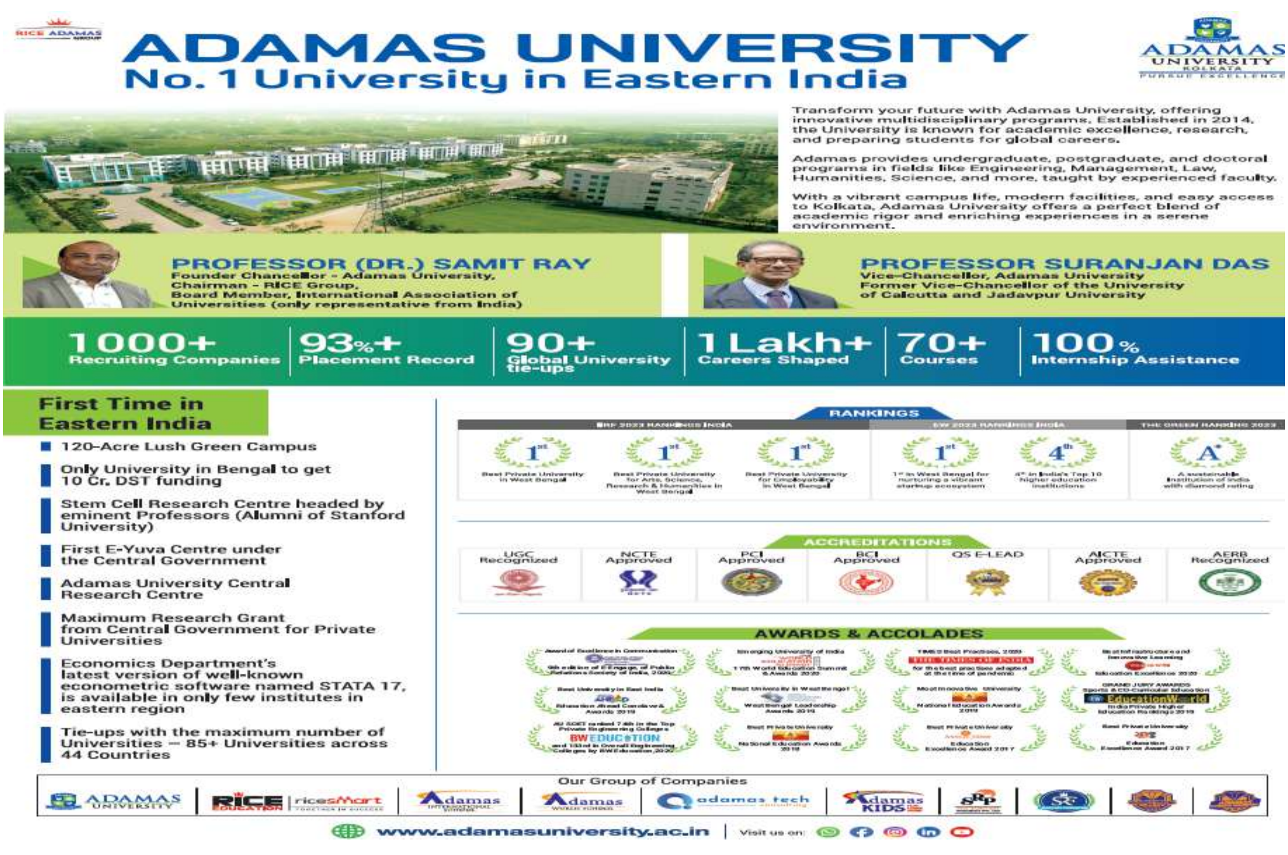

ফ্যাক্টরির সামনের দিকে যারা খাবার দোকান বা সেলুনগুলো চালায় সেইসব মানুষগুলোও তাকিয়ে আছে ওই ডিলটার দিকে। কারণ এই ডিলটাই ওদের ফ্যাক্টরিকে একদম এ ওয়ান স্তরে নিয়ে যাবে। আর তার লাভ চুঁইয়ে পড়বে ফ্যাক্টরির সঙ্গে দূর-দূর সম্পর্কিত মানুষদের মধ্যেও। পাওলো কেবল একা নয়, ওদের সবার মিলিত হাসি বাতাসে রঙের গুঁড়োর মতো মিশে যাবে ডিলটা সই হয়ে গেলে।

একটা ঝটকায় পাওলোর তন্দ্রাটা ছুটে গেল। ও দেখল গাড়িটা একটা বিরাট বড় বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই বাড়িটা অফিস নাকি হোটেল তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না একনজরে। পাওলো ওর পাশের মেয়েটির দিকে তাকাল। মেয়েটি ওকে নামার ইশারা করল,গাড়িটা ওই বাড়ির কম্পাউন্ডে ঢোকামাত্র। পাওলো নেমে দাঁড়িয়ে আরও একবার তাকাল উঁচু বাড়িটার দিকে। ঠিক যেরকম উঁচু বাড়িও পছন্দ করেনা তার চেয়েও অনেকটা উঁচু,যার ওই ছাব্বিশ বা বত্রিশতলা প্রতিনিয়ত আকাশে সপাট চুম্বন করছে যেভাবে ও চুম্বন করত সিনড্রেলাকে কিন্তু ওর এই পাশের মেয়েটিকে কি চুম্বন করা যাবে? নাকি এখনই ওই সবদিকে মন দিলে ডিলটা কেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা। পাওলো নিজেকে শাসন করতে আরম্ভ করল।

দুই

কম্পাউন্ডে দাঁড়িয়ে পাওলো যখন বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে,হঠাৎ করে ওর পিঠে ওই ড্রাইভার ছেলেটির হাত এসে পড়ল। এভাবে তো হাত দেওয়া কর্পোরেট সংস্কৃতির অঙ্গ নয়। আর ওই হাতের ভেতর এমন একটা কিছু ছিল যে থাকাটা তে সোয়েটারের ভেতরে থাকা মানুষও ঘামতে শুরু করবে। পাওলোর কেমন একটা মনে হল। ও ঘুরে তাকাল। মেয়েটা ততক্ষণে একগাল হেসে ওকে লিফটের দিকে দিক নির্দেশ করছে। লিফটে ঢুকতেই দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল এবং ওরা যে সংখ্যাটা টিপল,পাওলোর মনে হল সেটা তেত্রিশ। এখানে সংখ্যা সমস্ত চিনা হরফে লেখা। ইংরেজির কোনও বালাই নেই। তবু ওই নীচ থেকেও পরে যেতে যেতে পাওলো গুনছিল,ওর মনে হল তেত্রিশ তলায় গিয়ে থামবে। হতেও পারে ওটা বত্রিশ বা একত্রিশ। কিন্তু উঠে যেতে লিফট সময় নিল এক মিনিটেরও কম। আর লিফটের দরজা খুলতেই ও যখন এগিয়ে আসছে তখন আবার একবার ছেলেটির হাত ওর কাঁধে এসে পড়ল। এবার পাওলো উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই যে স্যুটে ওর থাকার কথা তার দরজা খুলে গেছে। মেয়েটি তার ভেতরে ঢুকতে ওকে ইশারা করছে কিন্তু পাওলোর পা ততক্ষণে জমে গেছে কারণ ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে সিনড্রেলা।

সিনড্রেলা বেঁচে আছে? আজ সাত বছর যার সঙ্গে একটি বার দেখা হয়নি অথচ একটা সময় সাত মিনিট যাকে না দেখলে মন আনচান করত সেই সিনড্রেলা বেঁচে আছে? আর আছে ইওরোপ পেরিয়ে এশিয়ার এরকম একটা শহরে? পাওলো এতদিন জানেনি? ও হতভম্ব হয়ে সিনড্রেলার দিকে তাকাল। সিনড্রেলা ওকে জাপানি কায়দায় বাও করে ঘরের ভেতরে আসতে বলল। আর পাওলো ঘরের ভেতর ঢুকতেই যেন ভোজবাজির মতো ওই ছেলেটি আর মেয়েটি মিলিয়ে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। পাওলোর ভালোলাগার পাশাপাশি কোথায় যেন একটা হাল্কা ভয় করছিল। আর ভয়টা হালকা থেকে ঘন হচ্ছিল ধীরে ধীরে। সিনড্রেলা কীভাবে এখানে এল? এখানে তো ওকে দেখতে পাওয়ার কথা না। আরও এসেছে ওর কোম্পানির ডিল সাইন করতে সেখানে সিনড্রেলার কাজ কী? সিনড্রেলা ওর ভাবনার ভেতরেই কিচেন থেকে একটা শরবত এনে ধরিয়ে দিল পাওলোর হাতে। এই সব স্যুটে একটা কিচেনও থাকে, কেউ চাইলে ব্যবহার করতে পারে। বলল, তোমার মনের প্রশ্নগুলো সব বুঝতে পারছি। তার উত্তর ধীরে ধীরে পাবে। আপাতত এই শরবতটা খাও'। শরবতটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল পাওলো। আর আচমকা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সিনড্রেলা। বলল, 'ভয় নেই, এতে বিষ মেশানো নেই'। পাওলো চমকে গেল একটু। এক ফোঁটা শরবত বোধহয় চলকে পড়ল মাটিতে। আর তখনই মনে হল এরকম অদ্ভুতভাবে সিনড্রেলা তো হাসত না। ওর হাসি ছিল খুব মৃদু। তাতে আওয়াজ হত না একেবারে। আজ এই নতুন হাসি সিনড্রেলা পেল কোথা থেকে? কিন্তু সে সব ভাবনার অবকাশ ওখানে ছিল না। পাওলো কিছু বলার আগেই সিনড্রেলা বলে যেতে লাগল'এটা একটা চমৎকার ঘটনা যে তোমাকেই কোম্পানি থেকে পাঠানো হয়েছে ডিলটা করার জন্য। আর আমি তোমাকে অ্যাশিওর করছি এই ডিলটা হলে এখানকার কাদের কী লাভ হবে বলতে পারব না। কিন্তু তোমার এবং তোমার কোম্পানির ভাগ্য একদম চাঁদে পৌঁছে যাবে। এই ডিলটার মধ্যে দিয়ে তোমরা যত অভ্র সাপ্লাই করবে তত ডলার তোমাদের কোম্পানিতে গিয়ে পৌঁছবে আর অভ্রর বিনিময়ে ডলারের সংখ্যা খুব একটা কম না। এতদিন যা যা স্ট্রাগল ছিল সেসব তুমি ভুলে যেতে পারো পাওলো। এখন নতুন দিন আসছে যা অভ্রর মতো চিকমিক করবে, ঝকমক করবে সারাক্ষণ'। বলতে বলতে একটু সামান্য পজ দিল সিনড্রেলা। আর ওকে ইঙ্গিতে বলল'খাও। সরবতটা খাও'। সরবতটার অসামান্য স্বাদ। পাওলো আলতো আলতো ঢোঁকে এক-দুচুমুক খেতে খেতে তারপরে একেবারে এক চুমুকে শেষ করে দিল পুরোগ্লাসটা। রাখার পর একটা নিদারুণ ফুর্তি হচ্ছিল,একটা আনন্দ হচ্ছিল ভেতরে। একটু আগের ভয় যেন ওকে ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। ও ভাবতে শুরু করছিল সিনড্রেলা এখানে কোথা থেকে এল। সিনড্রেলার এখানে আসার আগে ঘটনা পরম্পরা কী ছিল। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সিনড্রেলাই ওকে জিজ্ঞেস করল,'তারপর বাড়ির খবর কী?নাতাশা কেমন আছে?'

নাতাশার কথা সিনড্রেলা জানল কী করে? সিনড্রেলার হারিয়ে যাওয়ার প্রায় দেড় বছরের মাথায় নাতাশাকে ও বিয়ে করেছে। হ্যাঁ নাতাশা ওদের কোম্পানির একজন সামান্য কর্মী ছিল। কিন্তু সিনড্রেলা কি তাকে চিনত? এখন তার ভরভরন্ত সংসার নাতাশার সঙ্গে। দুই ছেলে এক মেয়েকে নিয়ে। বড় ছেলে ছয়, তার নীচে চার,মেয়ের বয়স দুই। সেখানে সিনড্রেলার প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়না কখনও। কিন্তু সিনড্রেলাতো ছিল, ওর ভেতরে গভীরভাবে ছিল। আর সিনড্রেলা ঠিক যাওয়ার আগে কানেকানে ওকে বলেছিল যে

নিশ্চিত না হলেও হয়তো সে সন্তান সম্ভবা।

তারপরেই ঘটে যায় সেই ঘটনা। সিনড্রেলা হঠাৎ করে ওর গাড়িটা নিয়ে ধাক্কা মারে একটা গাছে। আর তারপর সব কালো, সব অন্ধকার। সিনড্রেলা ওকে নাতাশার কথা জিজ্ঞেস করে থেমে থাকে না। আবার কিচেনে ঢুকে যায়। কিচেনে ঢুকে বলে‘তোমার ফেভারিট সমস্ত পদগুলো রাঁধছি। ম্যাকারনি,পাস্তা,প্রনলাগানশা’। পাওলো শুনতে শুনতে অবাক হয়। এই পদগুলোতো ওর জন্য নাতাশা রাঁধে। সিনড্রেলা কবে থেকে রাঁধতে শুরু করল? ততক্ষণে ওর মাথার ভেতর খুব ভারী কিছু অনুভব করছে। খুব আরামদায়ক কিন্তু ভারী। মনে হচ্ছে যেন ঘুমিয়ে পড়তে পারলে কোথাও একটা ভালো লাগবে। কিন্তু তার ভেতরেই হঠাৎ করে ওর সমস্ত শক্তি দিয়েও নিজেকে জাগিয়ে তুলে জিজ্ঞেস করে, ‘এগুলো তো নাতাশার আমার জন্য রাঁধা পদ। তুমি সমস্ত জানছ কী করে? তুমিতো মরে গেছ আজ অনেকদিন’।

-মরে গেলেই কি মানুষ মরে যায়? আবারও সেই উচ্চকিত স্বরে হেসে উঠল সিনড্রেলা।

আর তারপর ওর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আজ এই ডিলটা যেমন করতে যাচ্ছ এরকম একটা ডিল সাত বছর আগে নেপলস শহরেও হয়েছিল। যখন তোমার অধস্তন কর্মী নাতাশাকে তুমি বলেছিলে আমার গাড়ির ব্রেকটা একটু গোলমেলে করে দিতে। আর সেটা করার ফলেই যা হওয়ার তা হয় এবং নাতাশা যাতে আর তোমাকে ব্ল্যাকমেল করতে না পারে তাই ওকে বিয়ে করতে বাধ্য হও তুমি। কিন্তু কেন? আমি তো তোমাকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতাম। তাহলে কেন?’পাওলো চুপ করে রইল। তারপরে বলল, ‘নানা এগুলো সব মিথ্যা’।

-না মিথ্যা না। পুরোটাই সত্যি। আর তুমি সবটাই জানো। কিন্তু আমি যেটা জানতে চাই কেন আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিলে তুমি?

-তারপরও তো তুমি মরোনি। তুমি তো দিব্যি বেঁচে আছ। আমিতো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

-যা দেখা যায় তা সবসময় সত্যি হয় না। আমি কারণটা জানতে চাইছি তোমার থেকে।

-কারণটা এটাই,তোমার দিকে নজর পড়েছিল আমাদের কোম্পানির সেই সময়কার বিগ বস ডোনাল্ডের। আর ডোনাল্ডের স্ত্রী আমাকে লাগিয়েছিল তোমার পেছনে। বলেছিল শুধু প্রেমিকা করে তোমাকে ভাগিয়ে নিয়ে গেলেই হবে না। কারণ যেখানে তোমাকে নিয়ে যাব ডোনাল্ড সেখান থেকে তোমাকে খুঁজে বার করবে। তাই এই পৃথিবী থেকে তোমাকে সরিয়ে দিতে পারলেই আমার অন্তত চারটে প্রোমোশন বাঁধা। আসলে প্রমোশন চারটে হয়নি, হয়েছিল সাতটা। আর তারপর আরও দুটো প্রমোশোনের পর আমি নবম প্রোমোশনের সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়েছি। তুমি ভাবোতো,কদ্দিন আমি ওই ফ্যাক্টরির ইনচার্জ হয়ে থাকতাম?

-তাই বলে যে তোমাকে সবচেয়ে ভালোবাসত তার মৃত্যুর কারণ হবে?

-সবচেয়ে ভালো মানুষ নিজেকে নিজে বাসে। তার বাইরে আমরা কেউ কাউকে ভালোবাসি না। ভালোবাসার অভিনয় করি বা ভালোবাসার কথা বলি। কিন্তু নিজের স্বার্থে টান লাগলে তখন আমাদের প্রত্যেকের আসল মাধ্যাকর্ষণটা

EST 2022
HIMALAYAN MAGIC MASALA

কোথায় সেটা বোঝা যায়। আমি তোমাকে ভালোবাসতাম তাতে কোনও সংশয় ছিল না কিন্তু তোমার বিনিময়ে আমার নিজের উন্নতি আমার কাছে তত কিছু খারাপ মনে হয়নি। তাতো প্রাপ্যই মনে হয়েছিল।

-আর আজ যদি তোমার বিনিময়ে আমার উন্নতি হয়?

-কী উন্নতি? তুমি বেঁচে আছ এটাইতো একটা কত বড় উন্নতি। কারণ তোমার তো বাঁচার কথা নয়।

-যার বাঁচার কথা থাকে না, সেও বেঁচে যায়। যা হওয়ার কথা থাকে না, তাও হয়ে যায়। আর বেঁচে আছি না মরে গেছি তার বিচার কে করতে পারে? কে? বলতে বলতে সিনড্রেলা এসে পাওলোর ঘন চুলের মধ্যে হাত দিল। পাওলোর ঠোঁট দুটো আপনা আপনি খুলে গেল। সিনড্রেলার চুমু নেমে এল ওর ঠোঁটের ওপরে। আর সে চুমু যেন এমনি চুমু নয়। সে চুমুও কে শুষছে, শুষছে,এমনভাবে শুষছে যেভাবে মরুভূমির সমস্ত জল শুষে নিয়ে তাকে একেবারে শুকনো করে দেয় বালি ঝড়। সেরকমভাবে যেন ওর ভেতরের সমস্ত জলটুকু শুষে নিচ্ছে সিনড্রেলা। যখন সেই শোষণ শেষ হল পাওলো আর নিজের মধ্যে নিজে কিছু টের পাচ্ছিল না। ওর মনে হল ও নেই। ও যেন একটা হাওয়ায় ভাসছে। যে হাওয়াতে ওর শরীরটা ওর সঙ্গে নেই। কিন্তু কোথায় ওর শরীরটা? যে শরীরটা নিয়ে ও সেই ইতালি থেকে চিনে এসেছে, একটা চুক্তি সই করবে বলে। যে শরীরের হাতটা নিয়ে ও সাইনটা করলেই ওর আরও দুটো প্রোমোশন বাঁধা। ওর মাইনে বাৎসরিক ছঅঙ্কের ডলার থেকে আট অঙ্কের ডলারে পৌঁছে যাবে। কোথায়? সেই শরীরটা কোথায়? অনেক দূরে অনেক নীচে যেন পড়ে আছে শরীরটা। দেখতে পাচ্ছিল পাওলো কিন্তু কিছুতেই সেই শরীরটার সঙ্গে সংযোগ করতে পারছিল না।

তিন

তেত্রিশতলার ওপর থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুর কারণে পাওলোর পক্ষে আর সেই ডিল সাইন করা সম্ভব হয়নি যারজন্য কোম্পানি ওকে পাঠিয়েছিল কিন্তু কোম্পানি ওর স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যাকে সাধ্যমতো ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল। কোম্পানির তরফে অন্য একজন এসেছিল ওই ডিল সাইন করার জন্য কিন্তু তারপরে মাদার কোম্পানি সেই সইটা করেনি কারণ মনে হয়েছিল ওই সই করতে গিয়ে প্রথম একজন মারা যাওয়ায় ওই ডিলটাই হয়তো অপয়া হবে। প্রাচ্যের লোক,চিন-জাপানের লোক এখনও অনেক সংস্কার মেনে চলে। তার ফলে তাদের ঠিক ইওরোপীয় যুক্তি দিয়ে সবকিছু বোঝানো যায় না। পাওলোর তিন ছোট ছোট ছেলেমেয়ের তো কিছু বোঝার কথা নয় কিন্তু পাওলোর স্ত্রী নাতাশাও বুঝতে পারলনা কোম্পানির দেওয়া ক্ষতিপূরণের বাইরে হঠাৎ করে ওর কাছে ওই বিপুল অঙ্কের ডলার একটা সুটকেসে ভরে একটি যুবক ছেলে আর মেয়ে দিয়ে গেল কেন? মেয়েটির মুখটা অনেকটা সেইসিনড্রেলার সঙ্গে মিলে যায় যে সিনড্রেলাকে পথের কাঁটা বলে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল পাওলো ওকে। মেয়েটাকে ডেকে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিল পাওলোর স্ত্রী কিন্তু মেয়েটা কোনও উত্তর না দিয়ে গাড়িতে করে চলে গেল। আর নাতাশা সুটকেশটা খুলে দেখল থরেথরে ডলার, ডলারের পর ডলার। মানুষ চলে যায় কিন্তু মানুষের প্রয়োজন থেকে যায়। তাই ওই ডলারগুলো তে হাত দিয়ে ওর মনে হল কোথাও যেন একটা নিরাপত্তা ওরজন্য অপেক্ষা করছে আর সেই ডলারগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে ডলারগুলোর ভেতরে হঠাৎ করে ও একটা প্রেগনেন্সিকিট খুঁজে পায়। প্রেগনেন্সি কিটটা হাতে নিয়ে চমকে ওঠে নাতাশা। একি? এটাতে তো দেখা যাচ্ছে পজেটিভ। কে পজেটিভ ছিল? কার সন্তান? কার গর্ভে ছিল? চারপাশে একটা অট্টহাসি শুনতে পায় নাতাশা, কারও কোনও আওয়াজ শুনতে পায় না। হাতে প্রেগনেন্সি কিটটা ধরে পাওলোর সদ্য টাঙানো ছবির দিকে তাকাতেই সবটা স্পষ্ট হয়ে যায় ওর কাছে। যখন পাওলোর নির্দেশে গাড়ির ব্রেকটা খুলে দিচ্ছে ও, সেই সময় সিনড্রেলার গর্ভে ছিল পাওলোর সন্তান। প্রতিটা মৃত্যুর সঙ্গে এভাবেই কি জড়িয়ে যায় জীবন? পাওলোর মৃত্যুর পর ও যে জীবন নাতাশাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে ওর সন্তানদের মানুষ করার জন্য।

বাবা হওয়ার ট্রিট

তুলিকলা: অভি

জন্ম চন্দননগরে। শিক্ষাগত যোগ্যতা পিএইচডি। বয়স চল্লিশের নীচে, বড়ি আর কেলে কোট পরা টিটি ছাড়া সবই পছন্দ করি। পেশা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ট্যাটিসটিক্স পড়ানো। একাধিক বই, আনন্দবাজার, এই সময়, প্রতিদিন ইত্যাদি জায়গায় একাধিক লেখা প্রকাশিত।

সুমন সরকার

পার্ক স্ট্রিটের শাকিরা পাবের সামনে দাঁড়িয়ে আছে রাহুল । ঠোঁটে ঝুলছে জ্বলন্ত সিগারেট । পকেটে ফোনটা টুং করে একটা শব্দ করে জানান দিল হোয়াটসআপে মেসেজ এসেছে। রাহুল দেখল গৌরব মেসেজ করেছে -- 'আর পাঁচ মিনিট' । গৌরবের পাঁচ মিনিট মানে কম করে পঁচিশ মিনিট। সিগারেট ফেলে রাহুল দেখতে পেল সুমন্ত আসছে হন্তদন্ত হয়ে। ও চিরকাল এভাবেই চাপে থাকে। সুমন্ত এসে জড়িয়ে ধরল রাহুলকে--

--'ভাই কতদিন পর দেখা। হেব্বি মাল খাচ্ছিস ,ভুঁড়ি তো আম্বানির সম্পত্তির মতন বেড়েই চলেছে ?'

--'ভাই, আমার তো জন্ম থেকেই ভুঁড়ি, মাল খাই অথবা না খাই। তোরও তো দেখছি একটা সুখের ভুঁড়ি হয়েছে । যাইহোক, বাবা হবার অনেক শুভেচ্ছা। কেমন চলছে সব ?'

--'আরে বলব বলব। আগে একটা সিগারেট দে।'

--'তুই তো ছেড়ে দিয়েছিলি' !

--'আরে আজ কতদিন পর দেখা হচ্ছে, একটা সিগারেট নাহলে জমবে না। '

রাহুল, গৌরব, সুমন্ত তিনজন একসঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইকনমিক্স পড়ত। রাহুল কলকাতার ছেলে। গৌরবের পৈতৃক বাড়ি শ্রীরামপুর আর সুমন্ত থাকে সোদপুরে। রাহুল এখন থাকে বেঙ্গালুরুতে, একটা বিদেশী ব্যাংকে মোটা মাইনের চাকরি করে। গৌরব থাকে দিল্লিতে, ওখানে একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়। সুমন্ত সরকারি চাকরি করে। কলেজ জীবনকে বেশ কয়েকবছর আগে বিদায় জানিয়েছে ওরা। সকলের জীবন এখন আলাদা আলাদা রাস্তা দিয়ে চলছে । যোগাযোগ বলতে 'তিনমূর্তি' নামের একটা হোয়াটসআপ গ্রূপ। রাহুল আর গৌরব কলকাতায় এলে কোথাও মিট করে একটু পান-আহারের প্ল্যান হয়। ওদের সকলের বিয়ে হয়ে গেছে। গৌরবের যদিও ডিভোর্স হয়ে গেছে। সে এখন প্রেসিডেন্সি কলেজের পুরনো এক বান্ধবীর সঙ্গে লিভ ইন করে। রাহুল আর সুমন্তর সিগারেট শেষ। তারপরই গৌরব আবির্ভূত হল শাকিরা পাবের সামনে। গৌরব

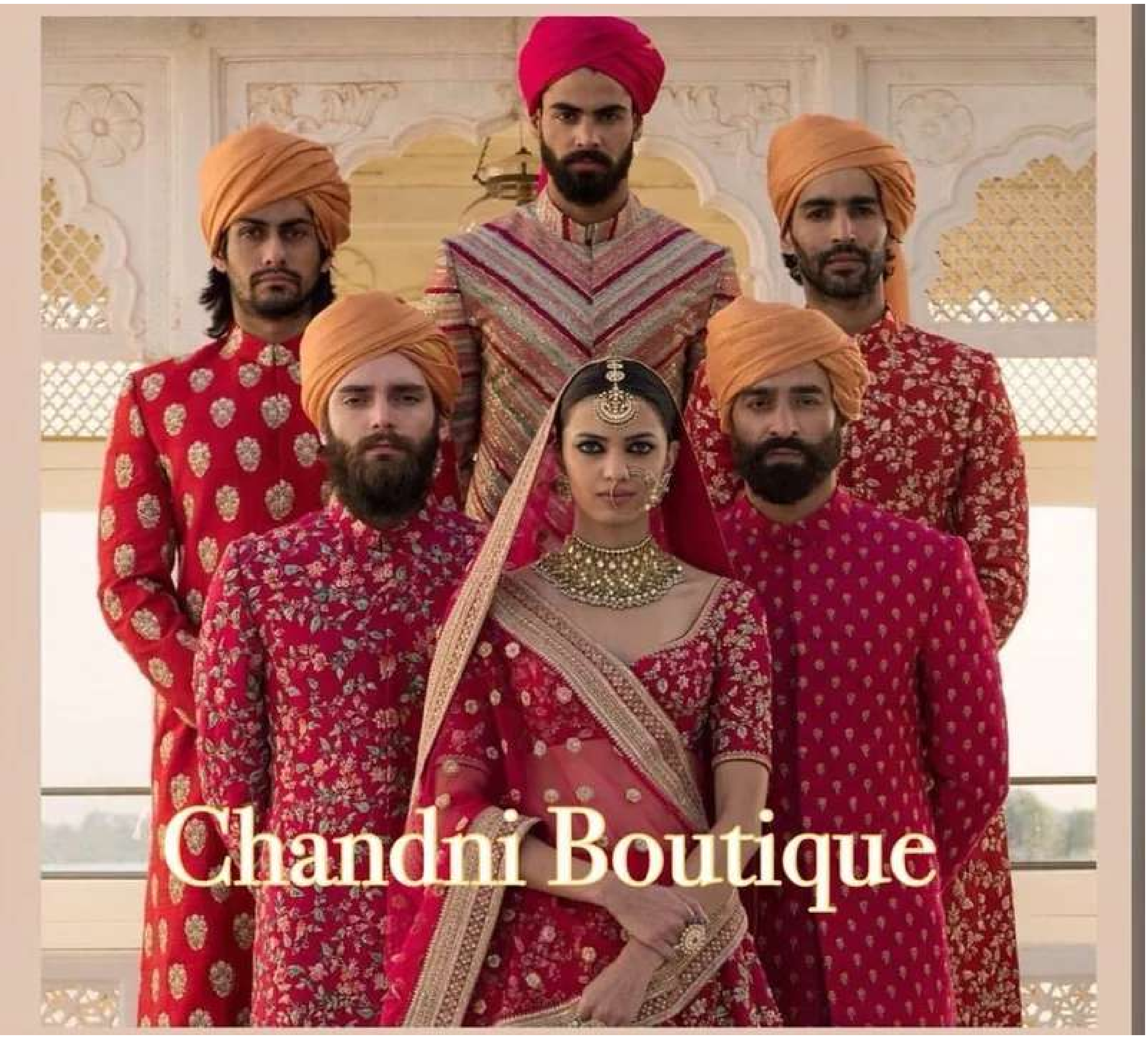

শারদীয়া শুভেচ্ছা

Chandni Boutique

(916) 259-9044

সুমন্তকে জড়িয়ে ধরে বলল,--'কঙ্গো ভাই কঙ্গো। ফাটিয়ে দিয়েছ কাকা । আজ তুই খাওয়াচ্ছিস তো ? বাবা হওয়ার ট্রিট।' রাহুল বলল,--'আরে সব কথা কি বাইরেই বলবি ! চল ভেতরে গিয়ে বসি। গলাটা শুকিয়ে গেছে । একটু দারুফারু না ঢাললেই নয়'। শাকিরা পাবের ভেতরে একটা টেবিল দখল করে নিল ওরা। হুইস্কি আর বিভিন্নরকম কাবাবের অর্ডার দিল সুমন্ত। তারপর কথা শুরু করল গৌরব--

--'কি বোকাছেলেরা লাইফ কেমন চলছে?'

--'আর লাইফ! বাবা হয়ে লাইফ ফুল চুলকে গেছে।'

--'কেন ভাই! এই যে ফেসবুকে কবিতা লিখছিস, 'নতুন একটা লাইফ, দুষ্টু আমি আর আমার ওয়াইফ...'

--'ফেসবুকের কথাকে তোরা আবার কবে থেকে সিরিয়াসলি নিচ্ছিস! গৌরব তো ফেসবুককে অশিক্ষিতের সুলভ শৌচালয় বলে'।

--'আমি ভুল কিছু বলিনি। কিন্তু, ফেসবুক করা ঠিক না বেঠিক এই তর্কে আমরা পরে আসব, আগে আমাদের নতুন বাবার গপ্পো শুনি'।

--'কি গল্প শুনবি ! সবার যেমন হয়, রাতে ঘুমটুম উড়ে গেছে। ছেলে ঘুমোতে চায়না। সারাদিন অফিস ঠেঙিয়ে বাড়িতে এসে রাতে জেগে থাকো। ফাঁকতালে ঘুমের সুযোগ খুঁজে নাও। সবচেয়ে জ্বলে যায় তখন, যখন কেউ বলে, আরে এই টাইমটা এনজয় করে নাও। এটা আর পাবে না, হ্যানা ত্যানা । সব শালা ঢপ। রাতে না ঘুমিয়ে কে এনজয় করে ভাই! পরদিন আবার অফিস! একদিন ওয়েবসিরিজ দেখছিলাম। বউ হেবি রেগে গেল। বলল, আমি দিনরাত না ঘুমিয়ে তোমার দামাল ছেলেকে সামলাচ্ছি আর তুমি ওয়েব সিরিজ দেখছ! একটা গান গেয়েও তো ঘুম পাড়াতে পারো!'

--'চাপ নিসনা। কদিন পর নর্মাল হয়ে যাবে সব। তবে তুই আবার গান টান গাইতে যাস না । একবার সেই পচাকুমারের হস্টেলে ফুল আউট হয়ে তুই টুম্পা টুম্পা করে সেই যে গান ধরলি, তোকে থামাতে গিয়ে আমাদের নেশা নেমে গেল'।

--'তুই বাপ হয়ে চাপ খাচ্ছিস আর আমি বাপ হইনি বলে লোকজন চাপ খাওয়াচ্ছে।'

--'রাহুল আবার কবে থেকে চাপ নিচ্ছিস ?আমাদের মধ্যে সুমন্ত সবসময় চাপে থাকত আর আমি কলেজে ইলেকশনের আগে । তোকে তো বাপের জম্মে চাপ নিতে দেখিনি । যখন আমাদের গোটা ব্যাচের থার্ড পেপার ফুল চুষে গেছিল তখনও তুই পরীক্ষা দিয়ে বাইরে এসে বহাল তবিয়তে লেবু চা আর গোল্ড ফ্লেক খাচ্ছিলি'।

--'শোন ভাই, পরীক্ষার চাপ হল লাইফের সবচেয়ে সহজ চাপ । প্রিপারেশন ভালো হলে উৎরে যাবি, নাহলে কেস খাবি । গোটা সিস্টেমটা তোর জানা । কিন্তু বিয়ের পর থেকে এমন এমন চাপ আসছে যার কোথায় লেজ আর কোথায় দাঁত বোঝাই যাচ্ছে না।'

--'কেসটা কী খুলে বল । বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ গৌরবও বুঝতে পারছে না মনে হয়'।

--'রাসকেল এটা ইকনমিক্স নয়! রাহুল তুই খুলে বল'।

--'আরে আমার আর শিঞ্জিনীরফ্যামিলি উঠে পড়ে লেগেছে বাচ্চা নেবার জন্য'।

--'এতে আবার চাপের কি হল! এই তো আমরা আজ যে মদ-মুরগি-মাটন প্যাদাচ্ছি এটার পেছনে কারণ তো সুমন্তর বাবা হওয়া। তুই ও হয়ে যা । এরপর জুলি পাবে ট্রিট দিবি।'

--'তুই বুঝবি না'।

--'কেন ?দুবার বিয়ে করেছি ভাই। তোর চেয়ে এক গোলে এগিয়ে আছি'।

--'লিভ ইন কবে থেকে বিয়ে হল ভাই'।

--'ওটাই বিয়ে । আমার কথা পরে হবে, তোর চাপটা আমার কাছে ক্লিয়ার নয় । তুই তো হিপি-বোহেমিয়ান নয় । বিয়ে করেছিস, দীঘা পুরী পাটায়া করে, বিয়ার খেয়ে পেট ফুলিয়ে একদিন দুম করে বাপ হয়ে যাবি । এই তো লাইফ'।

--'হ্যাঁ, আমি তোরমতো আঁতেল নই ভাই । কিন্তু বিয়ে করেছি মাত্র তিন বছর । আর একটু এনজয় করি লাইফটা। তারপর নয় ভাবব । কিন্তু, বাড়ির লোকজন একদম অন্য তালে নাচছে । এতদিন আমার বাড়ি আর শিঞ্জিনীর বাড়ির লোকেদের নিজেদের মধ্যে ফুল ইগোর লড়াই ছিল। এই বাচ্চার কেসটায় দুই বাড়ি একদম মহাজোট করেছে । বাচ্চা নেব না বলছিনা । কিন্তু কেউ যদি তাগাদা দেয় তাহলে কাহাতক ভালো লাগে । এখন শিঞ্জিনীও বেশ নেচে উঠেছে । বলছে, চলো ট্রাই করি । ছোটবেলা থেকে চলা এই ট্রাই করার চক্কর থেকে মুক্তি পেলাম না আজও। ভালো রেজাল্টের জন্য ট্রাই করো, চাকরির জন্য ট্রাই করো, আর এখন বাচ্চা ট্রাই করো। সেক্স এখন টাস্কে পরিণত হয়েছে! এই সুমন্তর মতন সুবোধ বালকদের জন্য আমি কেস খাচ্ছি।'

--'কেন ! আমি আবার কি করলাম !'

--'এত তাড়াহুড়ো কিসের তোমার! একদিন দুম করে ফোন করে বললি, বাবা হয়েছি! শালা, বৌভাতের ঢেঁকুর তুলতে তুলতে অন্নপ্রাশনের স্টার্টার এসে গেল'।

--'আরে কিছু করার নেই, ফ্যমিলি প্রেসার । আমার ঠাকুমার যায় যায় অবস্থা । বলল, হাতে বেশি সময় নেই, কিন্তু নাতির মুখ না দেখে যাব না ।'

--'আর তুমিও নাচতে নাচতে নাতির মুখ দেখিয়ে দিলে! ঠাকুমা তো দিব্যি বেঁচে আছে'।

--'হ্যাঁ, বুড়ি বলছে, এবার নাতনির মুখ দেখব'।

--'ওহ! তুই কি নাতনিও প্ল্যান করছিস নাকি!'

--'না ভাই। ক্ষমা কর।'

--'সেই ছোটবেলায় বাপ-মা যেমন বলত, দেখ গোপাল দিনরাত পড়ে, সুপারহিট মুকাবিলা দেখে না, আর তুই! তোদের দেখিয়ে সমাজ আমাদের চাপ দেয়। বলে, ওঠো, জাগো, ট্রাই করো'।

--'তুই ফালতু চাপ নিচ্ছিস। বেঙ্গালুরুতে কত্তা-গিন্নি মিলে থাকিস। বুড়োবুড়ি বাপ-মার ট্যানট্রামস নিতে হয় না। যখন ইচ্ছে মুখে বিয়ারের বোতল গুঁজে গোয়া-কুর্গ-মুন্নার

ছুটছিস। ফ্যামিলির চাপ কাকে বলে জানিসই না। বাবা-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি, মাসি-পিসি, ঠাকুমা-দিদিমা, ঝি সব মিলিয়ে থাকতে গেলে ব্রেন দইবড়া হয়ে হাতে চলে আসতো। যত মাথা, তত মাথাখারাপ !'

--'তুই তো দার্শনিক হয়ে গেছিস ভাই। বাণী ফানি দিচ্ছিস! করিস তো সরকারি চাকরি ! অফিসে তো চাপ নিতে হয় না। তাহলে বাড়িতেই একটু চাপ নে।'

--'আগের সরকার লোকের মনে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে সরকারি চাকরি মানে, আসি যাই, মাইনে পাই। ওই যুগ শেষ ভাই।তোর ধারণাই নেই আমাদের কতটা চাপ নিতে হয়। হ্যাঁ, তোদের প্রাইভেট সেক্টরে চাপ বেশি মানছি, কিন্তু আমাদের অডিটের কাজে চাপ নেই এটা বলিস না। তোদের চাপ থাকলেও মাসের শেষে মোটা মাল ঢোকেঅ্যাকাউন্টে। গৌরব কিছু বলছিস না! জ্ঞান-ট্যান ছাড় একটু। দেখছিস তো আমাদের লাইফ চুলকে বসে আছে।'

--'তোরা নিজেদের চুলকুনি নিজেই ডেকে এনেছিস। এই সংসার জিনিসটা হল এমন একটাঅ্যালার্ম ঘড়ি, হাজার চেষ্টা করেও যারঅ্যালার্ম কিছুতেই বন্ধ হয় না। তুই যতই ঘুমোবার চেষ্টা কর, এইঅ্যালার্ম ঘড়ি ঘুমোতে দেবে না। খেয়াল করে দেখবি, সংসারে সবসময় কিছু না কিছু বাওয়াল লেগে আছে। কিছু বাওয়াল তুই দেখতে পাচ্ছিস, সেটা ভালো। কিন্তু যে বাওয়াল হচ্ছে কিন্তু দেখতে পারছিসনা সেটা আরও ডেঞ্জারাস! সংসার বলতে বোঝানো উচিত একজন পুরুষ আর একজন মহিলা। কিন্তু, ওই যে কোন একটা ঢপের হিন্দি সিনেমায় অর্জুন কাপুর আলিয়া ভাটকে ইমপ্রেস করতে ভাট মেরেছিল--'আমি শুধু তোমাকে নয়, তোমার গোটা ফ্যামিলিকে বিয়ে করব!' ওইখানেই গাড্ডায় গেছে গোটা সিস্টেম। যে নৌকায় দুটো লোক বসার কথা সেখানে গাদা গাদা লোক উঠছে। এর দাবি মেটাতে গিয়ে নৌকো তার দিকে হেলে যাচ্ছে, আবার তার দাবি মেটাতে গিয়ে নৌকো তার দিকে হেলছে। এভাবে দুলতে দুলতে নৌকোডুবি হচ্ছে আর সেটা না হলেও দিনরাত নৌকোডুবির চাপ নিয়ে স্বামী-স্ত্রী মরছে ।'

--'আজ গুরু গৌরব ফর্মে আছে। গুরুর সেই কলেজ থেকে বক্তৃতা দেবার ফর্ম আজও টাল খায়নি। আচ্ছা, আমি নয় তাড়াতাড়ি বাপ হয়ে নিজে চাপ খাচ্ছি আর রাহুলের দাবি অনুযায়ী রাহুলকে চাপ দিচ্ছি। কিন্তু, তুইও তো ভাই বিয়ে করেছিলি রিসেপশনে হাজার টাকা প্লেট হাঁকিয়ে।'

--'হ্যাঁ, আমি মুরগি হয়েছিলাম!'

--'গুরু মুরগি হয়েছিল! কি কেস ভাই ?'

--'তুই তো জানিস ইরাবতীর সঙ্গে আমার কলেজ থেকে প্রেম। আমার বিয়ে ফিয়ে করার কোনও ইচ্ছে ছিলনা। কারণ, আমার সম্পর্ককে সমাজ সিলমোহর দেবে তারপর সেটা সামাজিক হবে এসব ফালতু ফান্ডা আমার পোষায় না। আর ওসব বাচ্চা টাচ্চা একদমই না। আমি নিজেই নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না, সেখানে আর একটা নতুন প্রাণ পৃথিবীতে এনে তাকে কীকরে ভালো রাখব! সহজ কথায়,

With best Compliments from

Dr Patricia Sing Choi DDS.MS,INC

2111 Parkside Dr. Suite A, Fremont, CA

Phone (510) 792-2333

- 21+ years of practice SF Bay area
- 5000+ patients with best smile in town!
- "Best of Fremont" for consecutive years.
- Full Satisfaction, Free Consultation. $250 OFF!!

Email: drchoi@choiortho.com
Web : www.choiortho.com

Braces and Invisalign®

INVISALIGN PROVIDER 2021 GOLD+

আমি ওই চাপটা নিতে চাই না বস। আমি কোথায় কখন থাকব জানি না। আমি দেশে বিদেশে ঘুরতে চাই, এই পৃথিবীটাকে চিনতে চাই, পড়তে চাই, দেখতে চাই, শুনতে চাই। সংসারের কচকচানি আমার জন্য নয়। আমার সঙ্গে আমার বাবা-মার মেলে না। তারা ভেবেছিল ছেলে বিয়ে করে গ্যারেজ হয়ে যাবে। ওদের কাছে বউয়ের অর্থ হল আমারমতো তারকাটা লোকেদের মাথার পোকা মারার ওষুধ। আমার মনে হয়েছিল ইরাবতী আমাকে বোঝে। আমি ওকে ভালোবাসতাম। আমি ঠিক করেছিলাম ওর সঙ্গেই লিভ টুগেদার করব, এই কলকাতা নামক ফালতু শহর থেকে দূরে গিয়ে। কিন্তু, একসময় ইরাবতী বলল, বিয়ে করলে ক্ষতি কি! আমিও গলে গেলাম। বিয়ে করলাম। আমি আর ইরাবতী ভালোই ছিলাম দিল্লিতে। তারপর ইরাবতী কেমন যেন সংসারী হতে শুরু করল। দিল্লিতে ফ্ল্যাট কিনবে বলল। আমার দিল্লিতে সেটল করার কোনও প্ল্যান নেই। আমি ফ্রান্সে একটা ফেলোশিপ জোগাড় করে চলে যাব ভাবছিলাম। তারপর ইরাবতী বলল, সে বাচ্চা চায়। যে সম্পর্কে প্রায় রোজই ঝগড়া লেগে আছে সেখানে সন্তান কী করে প্ল্যান করে আমার জানা নেই। ওই মৃত সম্পর্ক টানতে রাজি ছিলাম না আমি।'

--'তুমি লেজেন্ড ভাই ! রাহুল, গুরুকে দেখে শেখ। প্রেসিডেন্সির ব্যাচমেটকে ডিভোর্স দিয়ে একই ডিপার্টমেন্টের জুনিয়রের সঙ্গে লিভ ইন। কিন্তু তোর ফ্রান্স যাওয়া তো চুলকে গেল।'

--'যাব যাব। যাওয়া কি পালিয়ে যাচ্ছে।'

--'কিন্তু আমাকে এবার যেতে হবে। নাহলে বউ গোঁসা করবে। রাত দশটার আগে আমাকে বিছানার পাশে রিপোর্ট করতে হবে।'

--'আরে, কাকা আর একটু বসে যাও। প্রেসিডেন্সির প্রাক্তন ছাত্রনেতা গৌরব সেন আজ মুডে আছে।'

--'না ভাই, উঠতে হবে। অনেকদিন পর তোদের সঙ্গে দেখা হল, দু ঘন্টা ধরে দু পেগ হুইস্কি খেলাম, এটাই সেলিব্রেশন অফ লাইফ। রাহুল তুই প্লিজ চাপ নিস না। তবে আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, গৌরব লিভ ইন করতে করতেই আমাদের একটা গুড নিউজ দেবে।'

--'তুই ওই ভাব রাস্কেল! বাড়ি গিয়ে ঠাকুমার জন্য একটা নাতনি প্ল্যান কর। চল, যাওয়ার আগে একটা সিগারেট খেয়ে শো স্টপ করা যাক। রাহুল তো আজ শ্বশুরবাড়িতে থাকবি বলেছিলি। সিগারেট খেয়ে আমরা একটা উবার নিয়ে নেব।'

Best Compliments from

iGurukul Odissi

কৃষ্ণচূড়া

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

জন্ম ১৯.০৬.১৯৭৬। জন্ম কলকাতায়। ছোটবেলা কেটেছে বাটানগরে। ইংরেজি সাহিত্যের স্নাতক। উপন্যাস গল্প ও কবিতা লেখেন। গত সাঁইত্রিশ বছর দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা।

কোথাও তুমি সহস্রবার হারো
কোথাও তুমি হারিয়ে ফেলো আলো
মাঝরাতে ঘুম ভাঙার পরে বোঝো
সবার সঙ্গে থাকাই বরং ভালো

পথের ওপর পড়ে না আর ছায়া
গানের পাশে বাজে না তানপুরা
বুকে আমূল বিঁধিয়ে দিলে ছুরি
শরীরে ফোটে কৃষ্ণ-রাধাচূড়া

ফুল সরিয়ে মিছিলে যাও তুমি
দুচোখে আজ লক্ষ মোমবাতি
ঘুমের কথা মনে পড়ে না কারো
সামনে থেকে গায়েব হল হাতি

জাদু দেখায় গরিব ছেলেমেয়ে
সাহস ছাড়া আর কিছু নও তুমি
ফিরতি বলে সপাটে মার দিলে
বোলতা পারে ঝাঁকাতে বনভূমি

হারার পরেও আবার ফিরে আসো
ব্যথার শহর আগলে রাখো স্নেহে
সঙ্গে থাকার মতনভালোবাসা
আসুক তোমার সারা শরীর বেয়ে

শরীর তোমার কৃষ্ণচূড়ার মতন
মলিন হাতে সহস্রবার ছুঁলে
মরবে না তা—জানে না ওই দানব
যতই কাটুক, উঠবে ভরে ফুলে

তুলিকলা: শ্রীতমা রক্ষিত

মহালয়া

রাজদীপ রায়

জন্ম ১৯৮৪, হাওড়া। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। স্কুলশিক্ষক। প্রকাশিত কবিতার বই যদি না পুনর্জন্ম হয়, ধান দূর্বার দেশ, জন্মান্ধের আলো, সূর্যের বিষাদ, বিশল্যকরণী, রামকৃষ্ণের মুখে গল্প। সম্পাদিত সংকলন ফুল, পুতুল আর আগুন। দেবারতি মিত্রের নির্বাচিত সাক্ষাৎকার এবং অগ্রন্থিত গদ্য সংকলন। কবিতা ও অন্যান্য বিষয়ে নিবন্ধ লেখক।

জং ধরা রেডিয়োর সামনে
বসে আছি চুপ করে;

কখন তোমার রক্ত
গলা দিয়ে ছিটকে পড়বে--

আর শুরু হবে
এক শান্ত, ফ্রকপরা, অলৌকিক ভোর...

তুলিকলা: শ্রীতমা রক্ষিত

উত্তর সম্পাদকীয়

মনীষা মুখোপাধ্যায়

নিবাস বৈদ্যবাটি। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী। প্রথম শ্রেণির দৈনিক পত্রিকায় ফিচার বিভাগে কর্মরত। কবিতা ও গল্প দুই-ই লেখেন। চাকরিবাকরি ও লেখালিখির পাশে আকাশবাণীতে নানা অনুষ্ঠানের সঞ্চালক। শখ বইপড়া আর কানে রবীন্দ্রনাথ। পুরোনো বাংলা গানও ভারি পছন্দের। প্রিয় বই 'মহাভারত'। ভালোলাগা ফুটবল, ক্রিকেট আর খাওয়াদাওয়া। পরিবার-পরিজনের সঙ্গে আড্ডা দিতে ও কলকাতার পুরোনো রাস্তায় এলোমেলো হাঁটতে খুব ভালোবাসেন।

শব্দটা হবে 'ঝঞ্ঝাট'
আমি লিখলাম 'ঝামেলা'।

তারপর থেকেই খিঁচ লেগে আছে মনে
ঝঞ্ঝাট আর ঝামেলার মধ্যে
যেটুকু ফারাক,
তা বড় নাজেহাল করছে আমায়
বাথরুমে গিয়ে মনে পড়ল
শব্দটা হবে 'ঝঞ্ঝাট'।
আমি লিখেছি 'ঝামেলা'।

আমার এডিটর বললেন,
লেখাটা হলে ফেলে দাও তিনের ফোল্ডারে।
ফোল্ডারে আরও কত লেখা
ভ্রমণ, টুকরো খবর।
তাদের সঙ্গে আমার ভুল লেখা
বসে গেল চুপচাপ।

দিনশেষে এডিটর বললেন,
লেখাটা পড়লাম। ঠিক আছে পুরোটাই।

মনে মনে প্রমাদ গুনি
একা শুধু আমি জানি,
ঠিক নেই কিচ্ছু, লেশমাত্র না।

ঝঞ্ঝাটের জায়গায় বসে আছে ঝামেলা।
ঠিক যেমন
তোমার জায়গায়
আমার পাশে, সেই কবে থেকে,
শুয়ে আছে অন্য কেউ।

তুলিকলা: শ্রীতমা রক্ষিত

প্রবাসীর একান্নতম দুর্গাপূজা, সান্তা ক্লারা।

নিরঞ্জন রায়

সবার আশীষ নিয়ে প্রবাসী একান্নয় পা দিলো,
যে যেখানে ছিল পুজোয় একত্রিত হলো।
প্রবাসীর খ্যাতি যারা শুনেছিল,
সদস্য হবার জন্য তারা জড়ো হলো।
কে কার আগে লেখাবে নাম,
তাই নিয়ে হুড়োহুড়ি, না পায় পরিত্রাণ।
কোথায় হবে পূজো ভেবেছিল যারা,
অবশেষে ঠিক হলো সান্তা ক্লারা।
প্রবাসী সর্ববৃহৎ পূজো বে এরিয়ার,
সান্তা ক্লারায় মিলিবে এক বিরাট পরিবার।
নাচ গান নাটকের সাংস্কৃতিক আয়োজন,
নানা কুশিলবের সব মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান।
নানা দিকে ছড়িয়েছে নাম প্রবাসীর যেমন,
এর কৃতিত্ব সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রম।
পূজা শেষে আহারাদি তিন দিনে যত,
ব্যবস্থায় নেই ত্রুটি, সবই মনের মতো II
এ হেন মিলন মেলা কে না ভালোবাসে,
সবার শুভেচ্ছা নিয়ে যেন প্রতি বছর আসে II

মিতা

অনিন্দ্য পাঠক

তোমার সাথে আমি ছাড়িয়ে যাব,

সকল বাঁধা আমি মাড়িয়ে যাব,
নীরবে, নিভৃতে রব না এ জগতে,
তোমার আলো, মিতা, ছড়িয়ে যাব ।

দুর্জয়, নির্ভয়, তুমি চির-অক্ষয়-
রুগ্ন মানবের আমরণ সহায় ।
নৃশংসতা হতে করো মোদের উদ্ধার,
বিকৃতবাসনা যত করো তারে সংহার ।
তোমার রক্তে ধুয়ে যাক অরাজকতা -
পাশবিকতা মুছে, দাও মানবিকতা ।
হিংসা, বিদ্বেষ - তোমাতেই হোক শেষ

হৃদয়ে তুমি, মিতা, উজলি রবে ।

তিলোত্তমা

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

আর জি করে ডিউটি কোরে
ক্লান্ত অবসরে
বিশ্রাম নেয় তিলোত্তমা
সেমিনার ঘরে,

হায়নার দল ঝাঁপিয়ে পড়ে
ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেল তারে
একটি স্বপ্ন হারিয়ে গেল
চিরকালের তরে।

অনেক কষ্টে বাবা মা তারে
করেছিল ডাক্তার,
স্বপ্নেও ভাবেনি হবে এই
পরিণতি তার।

এ দেশ গভীর সংকটে আজ,
নিকষ অন্ধকার
তিলোত্তমার বিচার চেয়ে
সকলেই সোচ্চার ।

প্রতিবাদী স্বর গর্জে উঠেছে
বিশ্বের দিকে দিকে
সুপ্ত বাঙালির নিদ্রা ভেঙেছে
সাহস এসেছে বুকে।

বাবা মায়ের চোখের মণি ,
পাড়ার অহংকার
হারিয়ে গেল সাধের মেয়ে,
পেল না বিচার ।

মানুষের মুখোশ পরা
হায়না শকুনের দল
ঘুরছে সবার চারিপাশে,
সমাজের গরল।

যেথা খুনী ধর্ষকের হয়না
বিচার,
প্রমাণ লোপাট হয়,
তুমি তাদের বিচার করো
হে মোর করুণাময় ।

তিলোত্তমার জন্যে

মঞ্জুশ্রী সেন

আমরা তুলেছি ধিক্কার ধ্বনি প্রতিবাদের জন্য ,
কারণ আজকের সমাজ হয়েছে বড়ই বিপন্ন।
তিলোত্তমা, তিলোত্তমা মা গো আমার-
কত কষ্টই না হয়েছিল সেদিন তোমার।
৯ই আগষ্ট মধ্যরাতে মানুষরূপী রাক্ষসেরা দিল তাকে যন্ত্রণা,
চোখ দিয়ে তার রক্ত ঝরল তবু সে পেলনা করুণা।
কেন এত কষ্ট দিয়ে মারলো তাকে, কি তার অপরাধ?
আমরা চাই ওর খুনিদের শাস্তি দিয়ে মেটাক সবার মনের সাধ।
তাইতো মোরা সবাই মিলে বিচার চাই বলি,
তিলোত্তমার বিচার চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে চলি।
সবার ঘরে মা বোন আছে,
কন্যা তাদের বড় হচ্ছে-
অসন্মান থেকে বাঁচাও এদের,
অন্যায়কে শাস্তি দিয়ে দাঁড়াও পাশে তাদের।
যে মেয়েটা প্রাণ দিয়ে তার,জাগিয়ে দিল সমাজকে-
তার খুনিদের নজিরবিহীন শাস্তি দিয়ে প্রমাণ দাও রাজ্যকে।
বিশ্বে বাঙালিদের দাবী সঠিক বিচার,
নজিরবিহীন সঠিক বিচার।I
জানি সুপ্রিমকোর্ট দেবে ভরসা,
বিচার পাবো মোদের আশা-
সব মেয়েদের কথা ভেবে বিচার যেন সঠিক হয়,
তবেই হবে সব মেয়েদের অধিকারের জয়।
আবার হবে নতুন ভোর, নতুন সূর্যের হবে উদয় II

গানের ভেলা

অনিন্দ্য পাঠক

তোমার-আমার স্বপ্নপুরে
একটি খোলা আকাশ ছিল।
সেই আকাশের অরুণ আলোয়
ভালোবাসার আবেশ ছিল।

আকাশভরা নীলের মাঝে
সবুজ ঘেরা জল ছিল,
সকাল-সন্ধ্যা মাতিয়ে রাখা
পাখির কোলাহল ছিল|

তারা-ভরা আকাশ সাথে
জোনাকীর ফুলঝুড়ি,
ঝিঁঝিঁর ডাকে উঠত জেগে
তোমার-আমার স্বপ্নপুরী|

তোমার কথায়, আমার সুরে --
গানের ভেলায় ঘুরে ফিরে,
মন-খারাপের দিনের শেষে
তোমার-আমার রূপকথা।

তোমার-আমার ইচ্ছেবাড়ী
মন-যমুনার পাড় ঘেঁষে,
স্বপ্ননীড়ের দেওয়াল জুড়ে
গন্ধবিধুর ফুলের দেশ।

বিষণ্ণতার মেঘ চিড়ে আজ
ভালোবাসার বৃষ্টিপাত,
বৃষ্টিস্নাত হৃদয়ভূমে
সবুজমনের এই জীবনগান।

সাবধানে

অরুণাশিস সোম

কেপাল আমার ভীষণ পোড়া, অন্ত আদি
আগাগোড়া, বিষাদ বই!
বিষধারণের গল্প আছে, হয়ত আমি তোমার
কাছে, সামান্যই!

সবাই কাঁদে যাওয়ার বেলায়, দিনগোনা হয়
ফেরার খেলায়, ধুম জ্বরে!
দুঃখে কি আর রোজ ফেরা যায়? একলা
মানুষ জলছবি চায়, স্নানঘরে!

ঝমঝমিয়া বৃষ্টি আসে, শেষ লেখে কে
উপন্যাসে? এই ক্ষয়ে?
বিদায়কালীন ভাঙছে ছাতি, দুটি ঠোঁটের
চড়াইভাতি, আশ্রয়ে!

নিজের দুঃখ নিজেরই হয়, ঝাপসা কাচের
প্রচ্ছদে ভয়, সব ক্ষতি?
চতুর্দিকে টুকরো যত, ইগোর ভিড়ে পৃথক
কত দম্পতি!

বন্ধু অনেক কলম খাতায়, কেউ আসে না
ভরসা ছাতায়, খোঁজ নিতে!
অবুঝপনার রাত নামে তাই, একলা এ হাত
দুঃখে বাড়াই, হুইস্কিতে!

লিখবে তো ঠিক তোমার মনে, স্বপ্নে কোথাও
আলিঙ্গনে, রোজ চিঠি?
সাবধানে এই পথ পেরোবে, অনেকটা দূর
যেতেই হবে, লক্ষ্মীটি!

পৌঁছে একটা খবর দিও, লক্ষ্মীটি!

PANELS

Adrija Basu

Solar needs and deeds have us
Destroying the Mother Earth
For self gains
Haven't we taken enough?
Drafting tiles of solar panels
Where once walked wanderers of the earth -
our insects, animals, birds with a possibility of
discovering something beautiful and original
Have now been limited to tiles
Of solar panels, disrupting our fauna
Its good for the environment we say
As we continue to kill many species
Vultures once flew above these lands
Hunting for them, but they see none now
We changed their roles into human jobs
We have now embraced the vulture culture
And the technology is finally here to support
Such environmental damages via
Constant surveillance

The song of freedom

Adut Loi Akok

If we could give freedom to the neediest of it,
Smile to those we seek happiness
And then life to those who wish they could
Live longer for their dreams to come true.

I just have this thought in my mind all days,
wondering if I could write about the
Living martyrs within us.

The therapists are all slayed
The bible is banned and burnt,
Now we live like vultures and preys.

If we could be guided by nature's worth
Appreciate not the existence of war,
but peace.
If we could reach the sky of ages
And live a life unlike beasts.
We would forever smile, smile with peace.

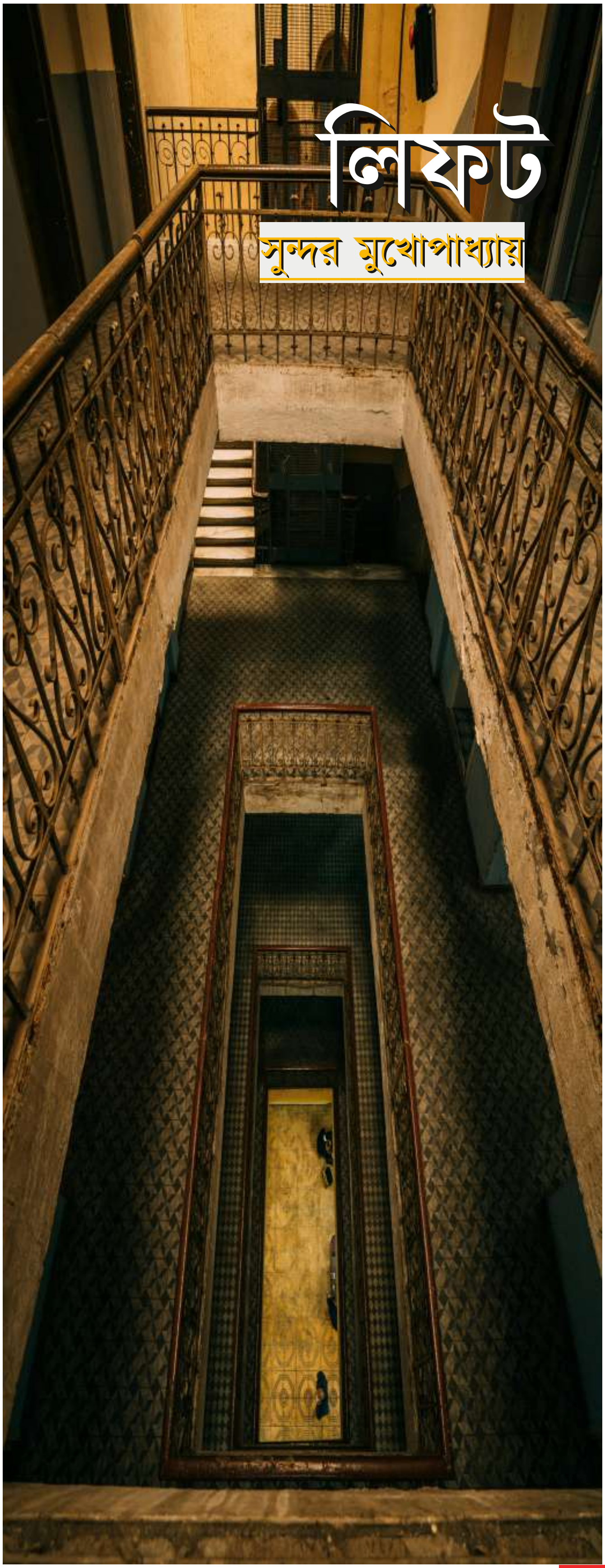

লিফট

সুন্দর মুখোপাধ্যায়

প্রথাগত শিক্ষা স্নাতক পর্যন্ত। চাকরি সরকারি দপ্তরে। নব্বই দশকের শেষভাগ থেকে গল্প লিখছেন। লিখেছেন দেশ আনন্দবাজার, সানন্দা, বর্তমান ও আরও কিছু পত্রপত্রিকায়। একটি গল্প সংকলন ও একটি রম্যরচনার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। লিখতে ভালবাসেন হাসির গল্প ও রম্যরচনা। নেশা আড্ডা এবং আড্ডা। বিপুল ও বিচিত্র চরিত্রসঙ্গই তার লেখার উৎস।

লেফট বিদায় নিয়েছে বছর বারো-তেরো হল। তবে তারা ছেড়ে গেছে লিফট। অলিতে গলিতে ফ্ল্যাট, আর ফ্ল্যাট মানেই লিফট। এবং প্রতিটি লিফটই সংশোধনবাদী—মাসে একবার বিগড়োবেই।

বছর দশ-পনেরো আগে, তখনও লিফট এতটা জলভাত হয়নি। হাওড়ায় সদ্যনির্মিত এক কমপ্লেক্সে লিফট একটু ঘন-ঘনই খারাপ হচ্ছিল, এক সপ্তাহের মধ্যেই দু-তিনবার। সেখানকার সম্মাননীয় আবাসিক জনৈক অবসরপ্রাপ্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল শিক্ষক এস কে এম গভীর পর্যবেক্ষণের পর আবাসনের মিটিংয়ে রায় দিলেন, 'মিস হ্যান্ডেলিংই এর কারণ। প্রত্যেকে যদি নিজের নিজের মেড সার্ভেন্টকে লিফটে চড়া শিখিয়ে দেয়...মানে কিছুই নয়...একদিনের একখানা ছোট্ট ক্র্যাশ কোর্স—হাউ টু ইউজ আ লিফট—তাহলেই আমরা এ সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারব।'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই আর এক আবাসিক বেসরকারি ব্যাংক কর্মচারী মিসেস সেন জিজ্ঞেস করলেন, 'কে শেখাবে?'

এস কে এম বললেন, 'কেন, যে যার নিজের মেড সার্ভেন্টকে।'

মিসেস সেন বললেন, 'আমার অত সময় নেই। বাড়ি থেকে বের হই সকাল আটটায়, ফিরতে ফিরতে রাত আটটা কি ন'টা।'

এস কে এম বললেন, 'কেন আপনার হাজব্যান্ড তো রাজ্য সরকারি করণিক, অঢেল সময়, তিনি শেখাবেন।'

মিসেস সেন খানিক চুপ করে থেকে বললেন, 'সেটা সম্ভব নয়...আমার ঝি সুন্দরী...।'

এস কে এম নিজের অভিজ্ঞতা উজাড় করে জবাব দিলেন, 'বুঝেছি। আপনি বোধহয় বুদ্ধি কম বোঝাতে চাইছেন...।'

মিসেস সেন তাকে থামিয়ে বললেন, 'আপনি সিচুয়েশনটা ঠিক বুঝতে পারছেন না...একটা বদ্ধ খাঁচায় আমার হাজব্যান্ড আর ওই সুন্দরী ঝি...না না।'

শিক্ষক মহাশয় হাঁ। এদিকটা তিনি ভেবে দেখেননি।

মিসেস সেন নিজের কথার খেই ধরে বললেন,

'তাছাড়া...শেখাতে হলে তো কয়েকবার ওঠানাম করতে হবে। এমনিতেই আমার ঝি একটু বেশি কথা বলে, বাইরে গিয়ে ওই ঝি যদি বলে, 'কী কাণ্ড...আমি আর ওই বাড়ির বাবু, একবার ওপরে, একবার নীচে...তখন?'

এবার সরাসরি দক্ষিণ কলকাতায় যাওয়া যাক। যাদবপুর তখনও বাম দুর্গ। সেখানকার এক আবাসনের মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হল সেলসম্যানেরা লিফট ব্যবহার করতে পারবেন না।

সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠলেন আবাসিক ভজন সরকার। তিনি সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ ইউনিয়নের দুঁদে সেক্রেটারি ছিলেন। এখন তাঁর মুখখানা সুখী গৃহস্থের মতো হলেও বজ্রমুষ্টিতে স্লোগান দিতে পিছিয়ে যান না। বললেন, 'সেলসম্যানেরা খেটে খাওয়া মানুষ...এ তো প্রতি বিপ্লবী সিদ্ধান্ত।'

'প্রতি বিপ্লবী' শব্দটা এতকাল সবাই দেওয়ালেই লেখা আছে দেখেছেন, এ যে ডেইল লাইফেও ব্যবহার করা যায়, এই প্রথম দেখলেন। বিপ্লবে পিছিয়ে পড়ার ভয়ে তারা সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন বলে শোনা যায়।

বাগবাজারে পুরোনো মল্লিক বাড়ি ভেঙে নতুন যে আবাসন হয়েছে সেখানে লিফটে সবাই অ্যালাউড। কোনও সমস্যা নেই। কেবল একদিন একটা ছোট ভুল হয়েছিল এই যা।

দুই এলাকা কাঁপানো ঝি আশা ও ভরসা সে আবাসনে যথাক্রমে বংশী গুপ্ত ও রাম মল্লিকের বাড়িতে কাজ করে। ছাদ থেকে শুকনো কাপড় ভতুলে দুই ঝি লিফটে নামছে, লিফটের ফ্লোর ম্যাটে দু-বাড়ির শুকনো কাপড় নামিয়ে রাখা। বেরোনোর সময় তারা সবই ঠিক ঠিক তুলেছিল কেবল দুটি নীল রঙের জাঙিয়া অদল বদল হয়ে গেল।

রবিবারের সাপ্তাহিক মিটিংয়ে কথাটা তুললেন রাম মল্লিক। বললেন, 'আজ আমাদের হয়েছে, কাল আপনাদেরও হতে পারে। এর একটা বিহিত না করলেই নয়...খুব আনসেফ...।'

প্রায় আশি ছুঁই ছুঁই মিন্টু গাঙ্গুলি বললেন, 'না না, অসুবিধে কিছু হবে না। আপনারা দুজনেই সত্তরের কাছাকাছি, সত্যি বলতে কী, এই বয়সে জাঙিয়া তো ফর শো...যে কোন একটা হলেই হয়।'

রাম মল্লিক রেগে গিয়ে বললেন, 'তা বলে অন্যের জাঙিয়া পরে কাটাতে হবে...কত রকম জার্ম টার্ম...।'

মিন্টু গাঙ্গুলি বলে বসলেন, 'জার্ম! বংশীবাবুর এইচআইভি পজিটিভ নাকি?'

নিখাদ সঙ্গীত সাধক নির্বিরোধী বংশী গুপ্ত এইচআইভি জীবনে শোনেননি। তিনি বোঝেন এইচএমভি রেকর্ড। বাড়িতে প্রচুর স্টক। উত্তরাধিকারসূত্রে বংশীবাবু পেয়েছেন। তিনি সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবার ছিল, আমাকে দিয়ে গেছে...।'

লিফটের মধ্যে ঘটে যাওয়া একটা সামান্য ভুলে কোথাকার জল কোথায় দাঁড়াল। বাঙালি জীবনে লিফটের এই বিপুল ও বহুমুখী প্রভাব নিয়ে সমাজ বিজ্ঞানীরা এখনও মাথা ঘামাননি। তবে খুব বেশি দিন তাঁরা বিষয়টা এড়িয়ে থাকতে পারবেন না।

প্রায় বছর বিশেক আগে কলকাতায় ফ্ল্যাট বুক করে জনৈক ঠাকুমা ন্যাওটা ভদ্রলোক দেশের বাড়িতে চিঠি দিয়েছিল, 'আমার ফ্ল্যাটটি পাঁচতলায়। তবে সিঁড়ি ভাঙতে হয় না। লিফট আছে। লিফট মানে যাতে চেপে চড়চড় করে ওপরে ওঠা যায়।'

তার দেশের বাড়িতে পায়খানা উঠোনের এক প্রান্তে, খাড়া পাঁচধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠে ও কম্মটি করতে হয়। জবাবি চিঠিতে ঠাকুমা লিখেছিলেন, 'তবে আমাদেরও ওটা পাঠিয়ে দে না, এই বয়সে জল ভর্তি মগ নিয়ে পাঁচধাপ সিঁড়ি ভাঙতে ভাল্লাগে না বাপু...।'

মৃতের সঙ্গে কিছু কথোপকথন

অনির্বান দাশ

যাও, Be Brave

পরিচালক মৃনাল সেন "পদাতিক" ছবিটির একদম শেষে প্রোটাগোনিস্ট সুমিত এর সাথে তার বাবা র একটি অনন্য সাধারণ মুহূর্ত চিত্রায়িত করেন। এক বৃদ্ধ, আপাত অশক্ত, সদ্য বিপত্নীক বাবা তার পুলিশের চোখ এড়িয়ে বাড়িতে ফেরা বড়ো ছেলের সাথে একটা সংলাপ এ আসেন । তিনি তার বিপ্লবী ছেলে কে জানান, যে তিনি ও কারখানা তে Strike না করার বন্ড এ সই করেন নি । ছেলে কে মা এর মুখাগ্নি করতে না দিয়ে তাকে চলে যেতে বলেন, ফিরে যেতে বলেন তার আদর্শের এবং স্বপ্নের কক্ষপথে। অজানা ছিল না তাঁর, যে বাইরে অপেক্ষা করছে ছেলের অবশ্যম্ভাবি মৃত্যু, তাও সেই বাবা অবিচল দৃপ্ত স্বরে ছেলে কে বলেন " যাও, Be Brave"। গত শতকের ষাট বা সত্তর এর দশকে মধ্যবিত্তের যে সামাজিক চেতনা বা তার আদর্শগত অবস্থান এবং দৃঢ়তা প্রতিবিম্বিত হতো রাজনীতি, সাহিত্যে, ছবিটির এই মূহুর্ত টি তেমন ই যেন তার এক জীবন্ত দলিল হয়ে থাকে আজ ৫০ বছর পার করে। বিগত ৩৫-৪০ বছরে সুমিতের বাবাকে আমরা যেমন হারিয়েছি আমাদের ব্যক্তি এবং সমাজ জীবন থেকে, তেমন ই হয়তো সুমিতদের ও । হয়তো সেদিনের সুমিতেরাও তাদের মেয়েদের বা ছেলেদের আজ কে আর Brave হতে বলেন না, বলেন হয়তো শুধুই Successful হতে !

ছায়া ঘনাইছে বনে বনে

লোডশেডিং , একটা মোমবাতি খালি জ্বলছে ঘরে, আর বাজছে একটা ট্রান্সিস্টর রেডিও, কোনো এক মহিলাকণ্ঠে চলছে গান টা। সোমনাথ এর বিবেকদংশন পরিচালক সত্যজিৎ এর ক্যামেরা ধরে নেয় একটা চরম নিরাসক্ত ভঙ্গি তে । অন্য ঘরে সোমনাথ এর বাবা, যিনি বেঁচে আছেন একাকিত্ব আর আশংকা কে বর্তমান জীবনসঙ্গী করে । সেতুর মতো আছেন সোমনাথ এর বৌদি, যাকে সোমনাথ অকপটে বলতে পারে, সে একজন দালাল। শুধু বলতে পারে না, একটা বিশেষ অর্ডার পাবার জন্যে তাকে তার মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ কে বিসর্জন দিয়ে দালালির কোন স্তরে নামতে হচ্ছে । মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালির সনাতন শ্রেণী চেতনাগুলো যেন একে একে ভেঙে পরে ছবির এই মুহূর্তে । সোমনাথ এর বাবা কে কষ্ট করে মেনে নিতে হয়, সোমনাথ চাকুরীজীবি না হয়ে ট্রেডিং এর ব্যবসা করে, আর সোমনাথ কে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় সেই কাজ করার জন্যে যা শ্রেণীগত ভাবে তার মূল্যবোধ এর বিপ্রতীপে। নিজের চোখে দেখা এই পতন শুধু কষ্টদায়ক ই নয় বাঙালি মধ্যবিত্তের কাছে, এ যেন একটা অসহায় আত্মসমর্পণ । নিজেকে ধিক্কৃত করার মধ্যে কোথাও যেন থাকে একটা আপ্রাণ চেষ্টা প্রায়শ্চিত্তের । হয়তো, সত্তর এর শেষ অর্ধেও বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে এই আত্মসমীক্ষা আর আত্মসমালোচনা র একটা পরিসর ছিল কিন্তু আজ ?

গড্ডলিকা প্রবাহ ই সত্য, ঐটাই খাঁটি, ভোগ ই মুক্তির পথ

হরপ্রসাদ তার বন্ধু ঈশ্বর এর কাছে আবদার করেন, তাকে কলকাতা নিয়ে যাবার জন্যে । ঈশ্বর জীবনে আর্থিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, হরপ্রসাদ পান নি। ঈশ্বর এর মতো এক সুযোগে রেফিউজি কলোনী ছেড়ে বাকি দের পরিত্যাগ করে সুদূর কোনো সুবর্ণরেখা নদীর ধরে একটা নিটোল আপাত সুখী মধ্যবিত্ত জীবন হরপ্রসাদ বেছে নিতে পারেন নি। কিন্তু যখন জীবনের ষোলো আনা খুইয়ে হরপ্রসাদ ঈশ্বর এর সাথে দেখা করতে আসেন বহু বছর পরে, হরপ্রসাদ ঈশ্বর কে বলেন, একসাথে কলকাতা যেতে, সেখানে আছে এক বীভৎস মজা, হোটেল এ , বাজারে, রেস এর মাঠে। এক পরাজিত বিপর্যস্ত মানুষ এর মতো হরপ্রসাদ কে বলতে শোনা যায়, যে গড্ডলিকাপ্রবাহ ই একমাত্র সত্য, ভোগ ই মুক্তির পথ। যে সেই প্রবাহের বিপরীতে সাঁতরাবার চেষ্টা করবে, তাকে ছুড়ে ফেলে দেবে এই সমাজ, এই ব্যবস্থা, ঠিক যেমন করেছিল পরিচালক ঋত্বিক কে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে অথবা মানিক বন্দোপাধ্যায় এর মদন তাঁতি কে। আমরা যারা গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসেছি, তারা আজ দেশে বিদেশে টিকে যেতে পেরেছি বাকি দের মতোই, যারাও ভেসেছে আমাদের ই মতো। আমাদের আমোদ ,আহ্লাদ, আনন্দ, চাহিদা গুলোর ও ঘটে গেছে একটা বাজার নির্ধারিত প্রমিতকরন। তাই এই একবংশ শতাব্দী তে আজ শোকের আয়ু ও সীমিত, ক্ষণস্থায়ী, অনেক টা ইনস্ট্যান্ট নুডলস এর মতো।

ধুর মশাই, আমি গড়পারের লোক, হিন্দি কি কেউ সাধে বলে নাকি ?

জটায়ুর সাথে ফেলুদা আর তোপসে র প্রথম পরিচয় এর যে দৃশ্য গুলো সত্যজিৎ চিত্রায়িত করেন, সেগুলো অনবদ্য। শুধু তার cinematic উৎকর্ষ বা বিনোদনমুলক আবেদনে নয়, শহুরে শিক্ষিত মনন এর যে সূক্ষ আধার গুলো উনি তুলে ধরেন সেই কথাবার্তায়, সেগুলোর মধ্যে একটা সেই সময়ের পশ্চিমবঙ্গীয় শহুরে বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনার আঁচ ধরা পরে। জটায়ু অকৃত্রিম বঙ্গীয় উচ্চারণ এ হিন্দি বলতে থাকলে তা শুনে আমাদের যেমন হাসি পায়, তেমন ই নিজেদের হিন্দি বলার ক্ষমতা বা অক্ষমতা সম্পর্কেও সতর্কিত হতে হয়। ফেলুদা বাঙালি জানবার পর, পরম আহ্লাদে, আস্বস্ততায় জটায়ু যখন বলে ওঠেন, "ধুর মশাই , হিন্দি কি কেউ সাধে বলে নাকি", যেন এক অবাধ স্বাধীনতার দ্বার খুলে যায়, বহুক্ষণ পরে নেওয়া একটা বিশুদ্ধ শ্বাস, অবাধ নীল আকাশের নিচে খোলা হাওয়ায়। ভাষা অনেকের মতে আমাদের চেতনা কে তৈরী করে, শুধু তাই নয়, ভাষার মাধ্যম এই আমাদের একটা সামষ্টিক চেতনা, ইতিহাসবোধ, বা একসাথে বাঁচার একটা যৌথ সামাজিক ভিত্তি তৈরী হয়। তাই ভাষা কে আঘাত করলে প্রতিরোধ আসে, এবং হয়তো প্রতিরোধ করা টাই কাজ।

'হয়তো এই ধারণ গুলোর কিছু আপেক্ষিক পরিবর্তন/ বিবর্তন ঘটে গেছে বা যাচ্ছে, তার সাথে সাথে আমাদের চিরায়ত সামাজিক রীতি নীতি উৎসব উপলক্ষ গুলো ও। তবু জটায়ুর ওই বাংলা বলতে পারার আনন্দে উদ্বেল অনাবিল হাসি টা হয়তো থেকে যায় অনেকের মধ্যেই। আর যারা চাই সেই প্রাণের আনন্দ, মনের আরাম টুকু কে ধরে রাখতে, চেষ্টা করি না বাঁচিয়ে রাখতে আরও কিছু দিন, আর ও কিছু বছর, আরও কিছু প্রজন্ম ?

কখন কোথায় কিভাবে বিস্ফোরণ ঘটবে, এবং তা কে ঘটাবে, সেটা জানতে আমাদের এখনো অনেক বাকি আছে

হার্বার্ট সরকারের মৃতদেহ যখন স্মশানের চুল্লি তে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তার কিছুক্ষনের মধ্যেই এক অপ্রত্যাশিত বিস্ফোরণ ঘটে চুল্লির ভিতরে, পুলিশ এর কর্তা বলেন, "A dead human bomb, কি বিচিত্র ডেটোনেশোন"। ডিনামাইট পাওয়া যায়, যা মৃতদেহের সাথে ঢুকে গেছিলো চুল্লির মধ্যে। কোনো এক অকিঞ্চিৎকর, আধ পাগলা সে ও কিভাবে এক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিয়ে গেলো, তাও মৃত অবস্থা তে ? প্রতিষ্ঠান কে স্মরণ করিয়ে দেয় যেন, এক আপাত নিরাপদ স্ফুলিঙ্গ ও বাঁধিয়ে দিতে পারে দাবানল। সুমন মুখোপাধ্যায় এর পরিচালনায় নবারুণ ভট্টাচার্য্য নির্মিত হার্বার্ট চরিত্র টি বড়ো পর্দায় এক অসাধারণ শিল্পকীর্তি। হার্বার্ট যেন সেই সাধারণ, non-entity, other যে কিনা সমস্ত ব্যবস্থা কে নাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে। এই Non entity রা একদিন জাগ্রত হবে সারা পৃথিবী তে, হয়তো আনবে কোনো আমূল পরিবর্তন; বিশেষ কোনো লাল, নীল, হলুদ বই এর সাহায্য ছাড়াই, শুধুই মানুষের ইতিহাস থেকে পাঠ নিয়ে । সেই অনাগত ভবিষৎ কে স্বাগত জানানো যাক, যন্ত্র / মানুষ কেউ ই হয়তো পারবে না, সেই বিস্ফোরণ কে সামলে নিতে, আবার নতুন করে হোক শুরু, ইতিহাস এর সমস্ত ক্লেদ, ব্যাধি কে সারিয়ে, নব জীবন নিয়ে । শুধু দরকার একটা আপাত নিরাপদ পবিত্র স্ফুলিঙ্গের।

পাদটীকা : এই লেখার শিরোনামের মূল শব্দবন্ধ টি নবারুণ ভট্টাচার্যের "হার্বার্ট" উপন্যাস এর থেকে উদ্ধৃত।

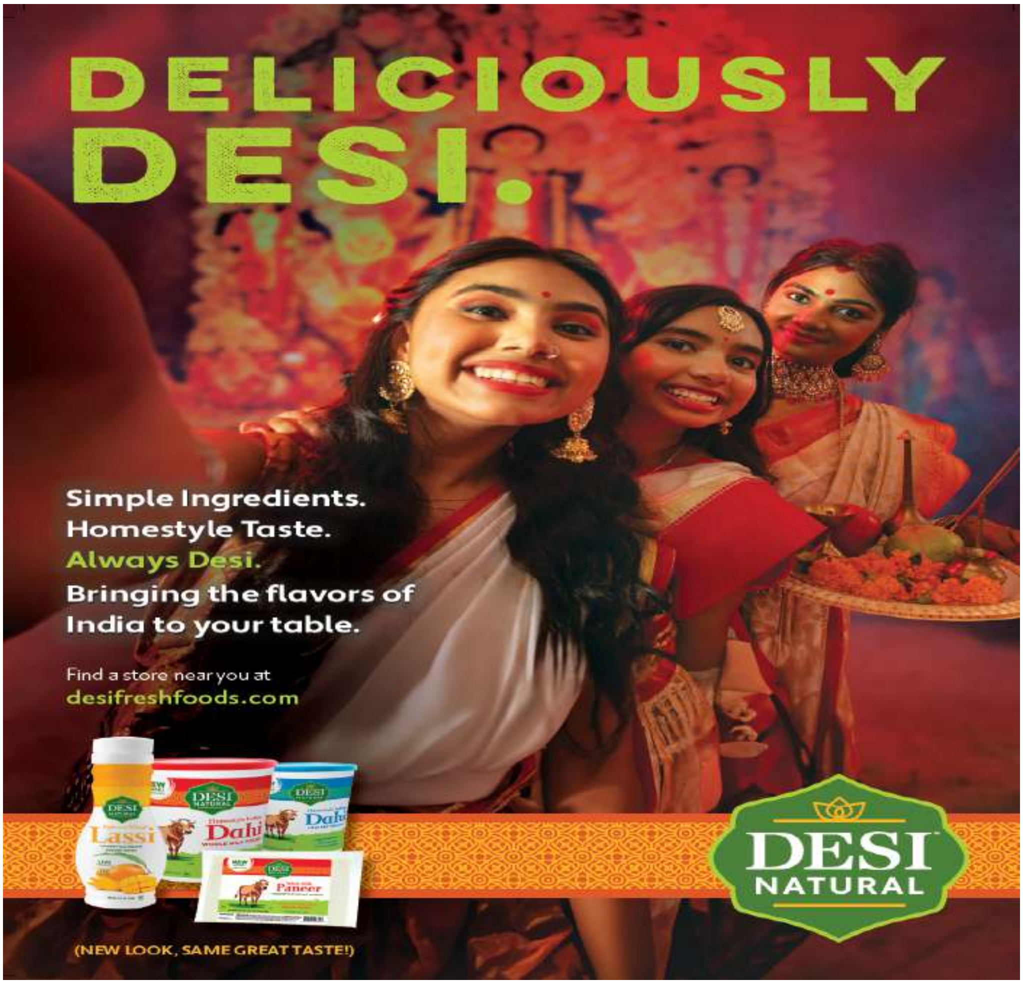

দুগ্গা এলো

কল্লোল চ্যাটার্জ্জী

"মিষ্টি... মিষ্টি..."

"তাড়াতাড়ি চলে এসো, খাবার বেড়েছি, এসো আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়তে হবে যে"।

মা এর ডাক শুনে পড়ার ঘর থেকে এক ছুটে চলে এলো মিষ্টি।

"কেনো মা ? আজ কি?"

"আজ কেনো কিছু হতে যাবেরে বোকা মেয়ে। কাল সকাল সকাল উঠতে হবে না, কাল যে মহালয়া !"

ভোর বেলা উঠতে মোটেই ভালো লাগেনা মিষ্টির, তবে সে প্রতি বছর দেখে এসেছে তার মা বাপি ভোর বেলা উঠে মহালয়া শোনে। আগে একটা পুরনো রেডিওতে চালাতো, এ বছর সেটা ভেঙে যাওয়ায় আর সারানো হয়নি। এবারে সোজা ইউটিউবে বাজবে।

যদিও মহালয়ার পুরো ব্যাপারটা মিষ্টির কাছে পরিষ্কার নয়। কিসের যে যুদ্ধ, কারা যে লড়ে, কেউ বা যেতে আর কেউ বা হারে, তাতে তার কিছু এসে যায় না। তার কাছে মহালয়া মানে আর কটা দিন বাদে ঠাকুর দেখা, নতুন জামা, ফুচকা খাওয়া, মা বাপির হাত ধরে ঘুরে বেড়ানো, আর সব চেয়ে বড় পাওনা যেটা সেটা হলো সামান্য কটা দিনের জন্য হলেও তার মা বাপিকে সারাদিনের জন্য কাছে পাওয়া। অফিস, কলেজ, স্কুল সব ভুলে সারাদিনের জন্য একসাথে থাকা।

প্রতিবারই পুজোর সময় তার মাথায় বিভিন্ন রকমের অদ্ভুত প্রশ্নের জাগরণ ঘটে, তা এবারই বা বাদ যায় কেনো?
তার মা তাকে শুধু বলে দিয়েছে যে, যাই প্রশ্ন আসুক না কেনো, সেটা যেনো পাড়ার পূজা মণ্ডপে দাড়িয়ে না করে সে। সবাই শুনলে নাকি হাসে!! যদিও আজ পর্যন্ত কেউ তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি, তবুও সবাই কেনো যে তার প্রশ্ন শুনে হাসতে শুরু করে, সেটা সে আজ ও বুঝতে পারে না। অগত্যা, তার প্রশ্ন বানের সম্মুখীন তার মা বাপি কেই হতে হয় দিনের শেষে।

"এই যে মা দুগ্গা ছেলে মেয়েদের নিয়ে চলে এলো, ওরা কি সত্যিই যে যার বাহনের পিঠে চড়ে আসে?"

"সিংহটা তো সবার আগে চলে আসবে। ও তো super fast। বাকিরা যদি রাস্তায় হারিয়ে যায়? যদি চিনে আস্তে না পারে? তাহলে কি হবে ?"

"ইদুরটা কি সত্যিই ওই মোটা ভুরিওয়ালা গণেশকে টানতে পারে ?"

"ময়ূরটা রাস্তায় আস্তে আস্তে পেখম মেলে দিলে কার্তিক কি পড়ে যায় ওর পিঠ থেকে ?"

"প্যাঁচা দিনের বেলায় ঘুমিয়ে পড়লে, লক্ষী কি করে? ও কি একা একা হেঁটে হেঁটে আসে?"

"হাঁস কি উড়ে আসে না হেঁটে? হাঁটতে গিয়ে পুকুর দেখলে কি হাঁসটা ডুব দেয়? হাঁসটা হটাৎ জলে নেমে গেলে সরস্বতী ওর বীণাটা কোথায় রাখে? ওটা ভিজে গেলে কি বাজানো যায়?"

আরো কত কি....

দুগ্গা আর তার ছেলেপুলের থেকে তাদের এই বাহনদের ওপর যেনো বেশি কৌতুহল মিষ্টির। এদের কথা ভাবতে ভাবতেই আজ শুয়ে ঘুমিয়ে গেলো সে।

"মিষ্টি... মিষ্টি..."

"উফফ! এই তো সবে ঘুমোলাম, এখন আবার কে ? "

"আরে এ তো সিংহ যে!!!! সাথে ইঁদুর, হাঁস আর ময়ূর!! "

"মিষ্টি, আমায় একটু মণ্ডপের রাস্তাটা চিনিয়ে দিবি please। আসলে আমার ডিরেকশন sense টা না পুরো গোল্লায় গেছে, দুগ্গা মা এত করে বললো গুগল ম্যাপস টা নিয়ে বেরোতে! কি করে যে ভুলে গেলাম!!!" বললে সিংহ

"আচ্ছা সে না হয় দেবো কিন্তু তোমরা তো বছর বছর আসো, এবারে রাস্তা ভুললে কি করে?"

"আরে সে কি বলবো! ডিরেকশন চেক মার্ক বদলে গেছে যে। প্রতিবার কৈলাশ থেকে নামার সময় পথে একটা মসজিদ পড়ে, সেখানে দাড়িয়ে কিছুক্ষন leg stretch করে নি, তারপর সোজা মণ্ডপ। এবারেও ওই একই রাস্তা দিয়ে আসছিলাম কিন্তু সেই মসজিদ যে দেখি আর নেই! কত ঘুরলাম কিছুতেই খুঁজে পেলাম না। দেখি রামের একটা নতুন মন্দির হয়েছে, তা ভাবলাম তাকে একবার জিজ্ঞেস করে নি, সে নিশ্চয় সব চিনবে তার পাড়ায়।
ও বাবা! সে তো সোজা denial mode এ চলে গেলো। বলে অন্যের বাড়ি ভেঙে যদি তার জন্য বাড়ি বানানো হয় সেখানে সে থাকে না।
ব্যাস! আর কি, রাস্তা হারিয়ে হয়রান অবস্থা আমাদের।"

"কি যে ছাই বললে! কিছুই ঢুকলো না আমার মাথায়! আরে আমি বলছি, তোমাদের তো দুগ্গা মার সাথে আসার কথা, একা একা ঘুরছো কেনো ?

আরে, একি! একি! কাঁদছই বা কেনো ?"
"কাঁদি কি আর এমনি! এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলে কৈলাশ এর বরফ গলতে শুরু করেছে। কাজেই মা দুগ্গা এবার মর্ত্যে নৌকায় আগমন নেবে প্ল্যান ছিল।

আর এখন gdp এর যা করুন হাল বড় নৌকা টা ঠিক পাওয়া যায়নি। মর্ত্যের লোকজন মণ্ডপ থেকে ছোট নৌকা টাই পাঠিয়েছে। আর তাতেই মা তার ছেলে মেয়েদের নিয়ে চলে গেছে।" হাঁস বলে উঠলো কেঁদে।

"যা! তোমাদের জায়গা হলো না ?"

"না। ওরা সবাই ওঠার পর একজনের জায়গা ছিল জানিস। আমি ভাবলাম আমি তো মার বাহন। আমিই special। আমাকে নিশ্চই তুলে নেবে মণ্ডপ বাহিনী।"

"এই, তুই আবার কিসের special রে? আমি হলাম সবচেয়ে ছোট। আমাকে তো চাইলেই নিতে পারতো! তাও নিল না!!!" গর্জে উঠলো ইঁদুর।

"নিলোনা তো!!! কিন্তু দেখি আমাদের সবাইকে ছেড়ে ওই হতচ্ছাড়া মোষ টাকে তুলছে। আর খালি জয় গৌমাতা, গৌমাতার জয় বলছে।
আমি বললাম এ কি! করছেন টা কি ? এ কে কেনো? আমরা সবাই বাকি থাকতে শেষমেশ এ!!! কত মণ্ডপে তো একে রাখাই হয় না !
আর হায় রে হতভাগার দল এটা গরু না! এটা মোষ! আগে গরু আর মোষ চিনতে শেখ! পড়ে গোমাতা বলবি।
কিন্তু কে কার কথা শোনে, নিয়ে গেলো ওকে ! আর রয়ে গেলাম আমরা একা আসবো বলে।" এই বলে সিংহ গভীর দুঃখে বসে গেলো।

"তোর আরো দুঃখ পাওয়া বাকিরে সিংহ ভায়া। সেদিন তোর বন্ধু বাঘের সাথে দেখা করতে গিয়ে দেখি কি ভীষণ টেনশনে আছে! বলছে যে কোনোদিন নাকি জাতীয় পশুর তকমাটা টেনে নিয়ে গরু কে দিয়ে দেবে !" হেসে বলে উঠলো ইঁদুর -
"আরে, আরে আরে। কি যে বলে চলেছ তোমরা সেই থেকে! তোমরা না গেলে তো পুজোই হবে না! তোমরা এখানে বসে দুঃখ না পেয়ে চলো তাড়াতাড়ি মণ্ডপ যাই।
আচ্ছা প্যাঁচা কে দেখছি না তো। ও কোথায় গেলো? আর ময়ূর ই বা এত চুপ কেনো ?"
"প্যাঁচা ব্যাটা খুব হয়রান । আগের বছর পুজোয় পাওয়া ৫০০-১০০০ টাকা গুলো সামলানোর দায়িত্ব ছিল ওর ঘাড়ে। এই Demonitization এর চক্করে এক্কেবারে নাজেহাল অবস্থা। কেউ exchange করে দিচ্ছে না। ভাবা যায়!!" বলে উঠলো হাঁস

"আর আমি কিই বা বলবো। আমার চুপ থাকাই ভালো। আমার আর কোনো মান সম্মান রইলো না গো এই দেশে। আগে মানুষে কত ভালোবাসতো, কত সম্মান দিত! আর এখন কিনা ভিডিও বানিয়ে ৩ টে গল্পের বই সাজিয়ে আমাকে দানা দেওয়া হয় !!! এমনি তো কেউ সংরক্ষণ বা কিছু করেই না, জাতীয় পাখির সম্মান টুকু ও আর রইলো না!"

"এ কি হাঁস, লাংরাচ্ছিস কেনো?"

"আহা! বিদ্যার দেবী র বাহন তো! আর তোদের রাজ্যের শিক্ষার যা হাল, মা বললো একটু বেশি করে শিক্ষা নিয়ে যেতে, যদি তোদের কোনো কাজে লাগে। এই শিক্ষাকে টানতে গিয়েই এই অবস্থা! শিক্ষার খুব ভার বুঝলি! শিক্ষা কে শুধু বহন করিয়াই চললাম বাহন করতে পারিলাম না!"

"এই ব্যাটা হাঁস, আবার রবীন্দ্রনাথ কে টুকছিস !!! এত জ্ঞান যখন একটু নিজস্বতা আনলে কেমন হয়! সবেতে খালি ঘুরে ফিরে রবীন্দ্রনাথ!!!" বলে ওঠে ইঁদুর

"আহা, উনিও তো ঠাকুর! "

"আচ্ছা আচ্ছা, অনেক হলো। তোমাদের বলতে দিলে এই দুঃখের আর শেষ হবে না। তার ছেয়ে বরং চলো মণ্ডপের দিকে যাওয়া যাক। তোমাদের ছাড়া ঠিক জমবে না।
অনেক কাজ আছে এখন গিয়ে। এ বছরটা কিন্তু আলাদা। সেই গতানুগতিক মোটা গোঁফ ওয়ালা অসুরটা কিন্তু এবার নেই। এই যে সিংহ, এবারে কিন্তু আর অসুরের সিক্স প্যাক এ থাবা বসিয়ে কাবু করতে পারবে না।"

"সে কি কেনো ? এবারে অসুর কে?" জিজ্ঞাসা করে উঠলো সবাই

"সে কি এটাও জানো না ! তোমরা কি খবর টবর দেখো না?"
"আরে, দেখি তো। আর সেই দেখেই তো মহাদেবের ভীষণ ভয়। খবর জুড়ে সারাদিন শুধু দেখাচ্ছে নেশা করা লোকেদের পুলিশ নাকি ধরছে। বাবা তো বুঝতেই পারছে না মর্ত্যে নামবে কি করে! এখানে আবার পুলিশের থেকে মিডিয়ার অত্যাচারটা বড্ড বেশি! তাই বাবা decide করেছে এবার যা

দেখার কৈলাশ এর ওপরে থেকেই দেখবে!" বলে উঠলো ইঁদুর।

"কিন্তু, অসুরটা কে সেটাইতো বললে না? সিক্স প্যাক ও নেই! বাজে মোটা গোঁফ টাও নেই! অথচ বলছে ভীষণ ভয়ানক ! কে এই অসুর?"

.

.

.

.

"এ হলো করোনাসুর !!!!!"

ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলো মিষ্টি! এটা কি হলো? কি দেখলো সে? সিংহ, হাঁস, ইঁদুর এরা সব কই? তাহলে কি স্বপ্ন দেখছিল সে? আর তারা কিই বা সব বলছিল!!! কিছুই তো বুঝতে পারলো না মিষ্টি। শুধু শুনতে পেলো পাশের ঘরে মা তার ইউটিউবে চালিয়ে দিয়েছে -

আশ্বিনের শারদ প্রাতে ....

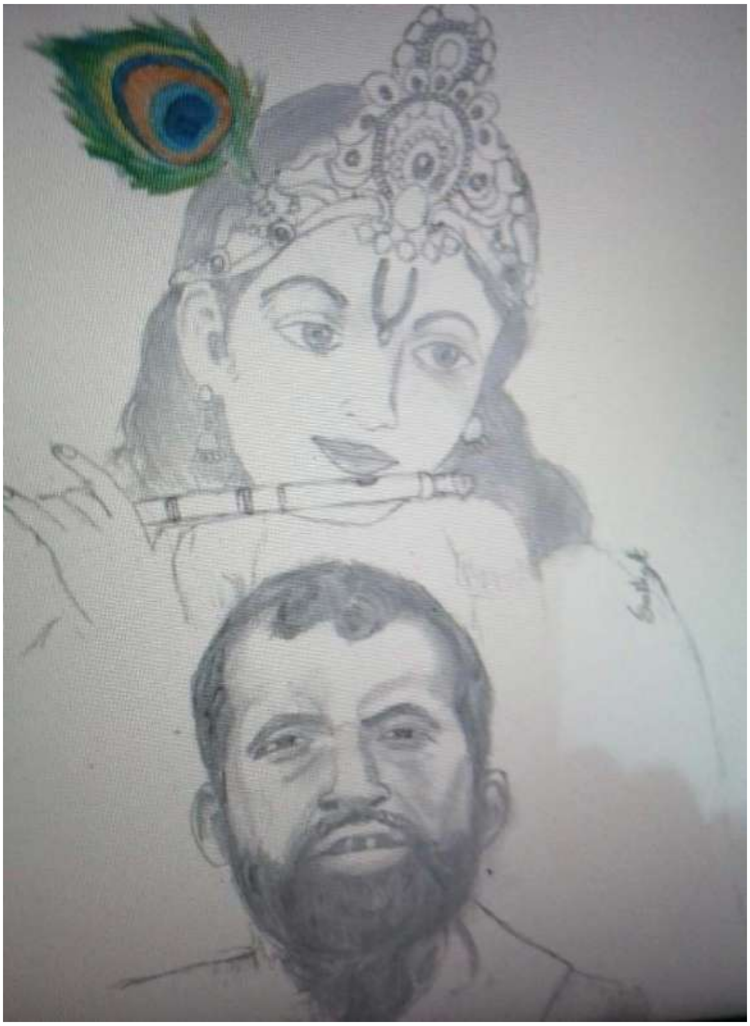

তুলিকলা: সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বস্তিক চিহ্ন

দিলীপ চক্রবর্ত্তী

স্বস্তিক চিহ্ন হিন্দু ধর্মের একটি অতি পবিত্র চিহ্ন। খৃস্টপূর্ব প্রায় এগারো হাজার বৎসর পূর্বেও এ চিহ্নটির ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ চিহ্ন কল্যানের প্রতীক, এ চিহ্ন প্রগতির প্রতীক, সকল রকম মঙ্গল অনুষ্ঠানে অনেকেই শ্রদ্ধাভরে ভূমিতে এ চিহ্নটির আল্পনা আঁকেন। হিন্দু ধর্মের যে কোন অনুষ্ঠানে স্বস্তিক চিহ্ন দেখা যায়, এ চিহ্ন ভারতীয় সংস্কৃতিতে সুখ , শান্তি ও সম্বৃদ্ধির কারক হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। এমন কি হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মালম্বীদের কাছেও এ স্বস্তিক চিহ্ন অতি পবিত্র। এ এগারো হাজার বৎসর পূর্বেও স্বস্তিক চিহ্ন বেদেও বিদ্যমান ছিল।

স্বস্তিক চিহ্ন প্রাচীনকালে ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা এবং আরও বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ছিল। রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে স্বস্তিক চিহ্ন অতি "ভালোথাকা ও সৌভাগ্যের প্রতীক" ছিল । ইউরেশিয়ায় প্রায় সাত হাজার বৎসর পূর্বেও এ চিহ্ন দেখা গেয়েছিল, সম্ভবতঃ আকাশে সূর্যের গতি লক্ষ্য করার জন্য। খৃস্টপূর্বে ইউরোপেও স্বস্তিকার ব্যবহার প্রচলিত ছিল।
প্রাচ্য ও ভারতের প্রাচীন সভ্যতার অনুসন্ধানে পুরতত্ববিদ শ্রী হাইনরিখ শ্লীম্যান ট্রয়ে স্বস্তিকা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি এটাকে একটি ধর্মীয় প্রতীক বলে মনে করেন। অন্যান্য পুরতত্ববিদগণ স্বস্তিকাকে আর্যজাতির সভ্যতার একটি প্রতীক বলে দাবী করেন। ইউরোপে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ব্যাপকভাবে স্বস্তিকার প্রচলন ছিল। স্বস্তিকাকে একসময় খাঁটি আর্য প্রজাতির নিদর্শনবলে ধরা হ'য়েছিল, আর সেজন্যই হিটলারের ছবির সাথে একটি স্বাস্তিকাসহ পতাকা খাঁটি আর্য জাতির পরিচয় বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল, এটাই হয়েছিল জার্মান জাতির গর্বের কারণ, আর জাতির পবিত্রতার প্রতীক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর স্বস্তিকাই হয়েছিল বিকৃত মস্তিষ্কের অধিকারী হিটলারের জাতিগত বিশুদ্ধতার মূর্ত প্রতীক। তার পরের ইতিহাস আমাদের সকলেরই জানা – ইহুদী নিধন যজ্ঞে উন্মত্ত হয়ে কয়েক কোটি ইহুদীর প্রাণ নিয়েছিল এই উন্মত্ত বিকৃত মনের একটি জঘন্য মানুষ যার নাম ছিল এডলফ হিটলার। তার ফলেই আজ সারা পৃথিবীর কাছে হিন্দু ধর্মের পবিত্র এ স্বস্তিকা হয়ে গেল হিংসা ও ঘৃণার প্রতীক। যে কোন ইহুদি পরিবারের কাছে স্বস্তিকা সৌভাগ্য ও কল্যানের প্রতীক নয় বরং দুর্ভাগ্য ও ইহুদি নিধনযজ্ঞের প্রতীক। হিটলারের দলীয় পতাকায় ছিল স্বস্তিক চিহ্ন, মঙ্গলে অমঙ্গলের ছাপ, আর সেজন্যই স্বস্তিক হয়েছে আজ হিংসা, রক্ত আর বর্বরতার সাক্ষী – আর এ জন্যই বহু দেশে আজ স্বস্তিক হয়েছে "অবিচারের" শিকার।

প্রাচীনকালে স্বর্গলোকে বিভিন্ন সময়ে শুম্ভ, নিশুম্ভ বা ঘটোৎকচ নামের বা আরো বিভিন্ন দৈত্যের আক্রমনে স্বর্গের শান্তি বিঘ্নিত হলে প্রাণ রক্ষার্থে সকল দেবদেবীগণ ভগবান শ্রী বিষ্ণুর শরণাপন্ন হতেন, তখন শ্রী বিষ্ণু বিভন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে দৈত্যদের দমন করে স্বর্গের দেবদেবীদের রক্ষা করতেন। কলিযুগের দৈত্যরূপী

হিটলার পৃথিবীর শান্তি ভঙ্গ করে লক্ষ লক্ষ ইহুদিদের হত্যা করেছে, আর সাথে হিন্দু ধর্মের পবিত্র প্রতীক স্বস্তিকের অবমাননা করেছে। কিন্তু এমন একটা হিংস্র রক্তপিপাসু নরখাদকের লিপ্সায় স্বস্তিকার মহিমা কখনো অম্লান হয়ে যায়নি, বরং স্বস্তিকাকে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি হয়েছে বিভিন্ন দেশে। একদিন স্বস্তিক স্বমহিমায় আবার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে। স্বস্তিকের প্রতি হৃত শ্রদ্ধা ও ভক্তি আবার ফিরে আসবে।
স্বস্তিক দুই প্রকার, দক্ষিণমুখী ও বামমুখী। দক্ষিণমুখী স্বাস্তিক হিন্দুদের কাছে সূর্য বা প্রগতির প্রতীক, আর বামমুখী স্বস্তিক রাত্রি বা তন্ত্রের প্রতীক। জৈন তীর্থঙ্কর ও ভগবান বুদ্ধের পাদ ফলকে আমরা এ পবিত্র চিহ্ন দেখতে পাই।
এ পবিত্র চিহ্নের চারটি বাহুকে হিন্দুধর্মে বিষ্ণুর চারটি বাহুর সাথে কল্পনায় সামিল করেন, আর কেউ বা এ চিহ্নের চারটি বাহুকে ব্রহ্মার চারটি মুখের সাথে তুলনা করেন।

এভাবেই সর্বদা তিনি সমগ্র বিশ্বের সর্বদিক পর্যবেক্ষণ করছেন।
স্বস্তিকের কেন্দ্রবিন্দুকে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর নাভিকমলরূপে গণ্য করা হয়ে থাকে, সেজন্য স্বস্তিক ধরাধামে বিষ্ণু প্রতীক হিসেবে বিরাজমান। ভগবান শ্রী বিষ্ণু হলেন স্বর্গ, মর্ত ও পাতালের পালক ও রক্ষক, তাই হিন্দু ধর্মে যখন স্বস্তিক চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়, তখন সব কিছুই পরমপিতা শ্রী বিষ্ণুতুল্য হ'য়ে যায়, এবং গৃহস্থের মঙ্গল সাধন করে। প্রধান প্রবেশদ্বারের ভিতরের দিকের স্বস্তিক চিহ্ন গৃহস্থের সুরক্ষা ও মঙ্গল সাধন করে। হিন্দু ধর্মে স্বস্তিক প্রতিটি মানুষের কাছে এক প্রণম্য প্রতীক।
আমরা বাঙালিরা পঞ্চাশ দশকেরও বেশি আমেরিকায় বসবাস করছি। আমাদের কাছে স্বস্তিক চিহ্ন অতি পবিত্র হলেও আমেরিকায় ভারতীয়দের বাড়িতে "স্বস্তিক চিহ্ন" লাগানো বা প্রদর্শন আইনস্মমত ছিল না। কিন্তু আমেরিকার বিভিন্ন হিন্দু সংঘঠনের আন্দোলনের ফলে আজ আমেরিকার প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই ভারতীয়দের জন্য "স্বস্তিক চিহ্ন" বাড়িতে প্রদর্শন বা সংরক্ষন আইনসঙ্গতভাবে সুরক্ষিত করা হয়েছে। হিন্দু সংগঠনগুলি আমাদের সকলের ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার দাবী রাখে।

স্বস্তিক দুই প্রকার, দক্ষিণমুখী ও বামমুখী। **দক্ষিণমুখী স্বাস্তিক হিন্দুদের কাছে সূর্য বা প্রগতির প্রতীক, আর বামমুখী স্বস্তিক রাত্রি বা তন্ত্রের প্রতীক।**

IN MEMORIAM OF DR. SHAKTI DAS

Personal perspective

Our beloved Sakti Da (Dr. Sakti Das) passed away on 10-09-2024, leaving behind a profound legacy of compassion, dedication, and community service. As a long-time resident of the San Francisco Bay Area, Sakti Das became an integral part of our lives and the Prabasi community. His unwavering commitment to our non-profit organization was evident in the countless hours he devoted to ensuring our mission flourished. Whether through organizing cultural events, supporting educational programs, or simply lending a helping hand, Sakti Da's presence was a beacon of hope and kindness for all who knew him.

Sakti Da's contributions to Prabasi were immeasurable. He was not just a member but a pillar of our community, always ready to step up and lead by example. His passion for promoting our cultural heritage, combined with his professional accomplishments, inspired many. Sakti Da’s efforts extended far beyond organizational tasks; he brought people together, fostering a sense of unity and shared purpose. His warmth, generosity, and tireless work ethic made an indelible impression on everyone he encountered. While his passing has left a void that can never be filled, the impact of Sakti Da’s life and work will continue to resonate within our hearts and community. His legacy of dedication to cultural preservation, education, and humanitarian efforts will serve as a guiding light for future generations. We honor his memory by carrying forward his mission and embodying the values he championed. Sakti Da will be dearly missed, but his spirit will live on through the lives he touched and the work he inspired.

Professional perspective

Professional perspective

Dr. Sakti Das (1939-2024) was a luminary whose profound contributions have left an indelible mark on both the medical and academic worlds. As the founder of the Tagore Program on Literature, Culture, and Philosophy at the Institute for South Asia Studies (ISAS) at the University of California, Berkeley, Dr. Das shared his passion for Rabindranath Tagore’s humanistic ideals through his academic and philanthropic efforts. His establishment of the Tagore Program created a vital platform for the interdisciplinary exploration of Tagore's contributions to literature, culture, philosophy, and education, fostering important conversations around these themes at the heart of South Asian studies.

Born in Kolkata, Dr. Das was profoundly shaped by the writings of Rabindranath Tagore from an early age. This intellectual and cultural influence resonated throughout his life, leading to the establishment of a program that united scholars, artists, and thinkers to delve into Tagore’s rich and diverse body of work. Dr. Das held a deep belief in Tagore's vision of a holistic, human-centered education, and through the Tagore Program, he ensured that future generations of students and scholars at Berkeley and beyond would engage with these profound ideas. His lifelong commitment to Tagore's legacy and his contributions through the Institute for South Asia Studies have left an enduring imprint on the academic community.

Beyond his contributions to the humanities, Dr. Das was an internationally renowned urologist. He served as a staff urologist at Northern California Kaiser Permanente for 20 years and was a professor of urology at the University of California, Davis. His prolific career included authoring nearly 200 scientific articles and book chapters, editing or co-editing 11 textbooks, and training numerous urology residents and fellows. He also served as the historian for the American Urological Association, where he was instrumental in expanding their historical collections and was recognized with numerous awards, including the AUA’s Humanitarian Recognition Award in 2022. Dr. Das’s compassion extended far beyond the medical field as he continued to champion global humanitarian efforts, supporting primary education centers and orphanages in various countries. His legacy of compassion, scholarship, and dedication to social justice will continue to inspire future generations.

In addition to his esteemed career as a doctor, Dr. Das devoted his entire life to improving the lives of women and marginalized communities and created the Caring Hands Foundation. His commitment to social justice and humanitarian efforts knew no bounds, with the Foundation’s impact reaching far beyond the USA to touch lives in Haiti, Kenya, Nepal, and India. Through his tireless work, Sakti Da championed the cause of the underserved and worked relentlessly to bring hope and better opportunities to those in need.

Dr. Das is survived by his wife, Dr. Maya Mitra Das, and their son, Rajarshi "Raja" Das.

শিল্পী: Anwesha Dutta

Embrace the Festive Magic

BOLLYWOOD

CALL: 650-938-2400 I Email: bollybeautysalon@gmail.com
Location 1: 820 E. El Camino Real, Mountain View, CA 94040
Location 2: 2855 Stevens Creek Blvd,
Store No.: 1065 Santa Clara, CA 95050 (Westfield Valley Fair Mall)

Best compliments from